বাংলাদেশে
গেরিলা যুদ্ধ

আবু সাঈদ

৪০০ পয়সা

১০০
নম্বর

বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ

মহানগর পাঠাগার ★ ঢাকা ★

মহানগর পাঠাগার ★ ঢাকা
তাং

A-3043

বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ

আবু সায়ীদ

মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭১
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ১৯৭২
তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৩

মুক্তধারা ৭৮২

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
নীতিন কুণ্ডু

ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১

মূল্য : এগার টাকা

এ- ৬০৪৬
১০০
~~৩৫৪৪~~
~~[illegible]~~

১১।৫।৮৮

BANGLADESHER GUERILLA YUDDHA
[Guerilla War in Bangladesh]
by Abu Sayid
MUKTADHARA
[Prop. : Puthighar Ltd.]
74 Farashganj
Dhaka-1
Price : Taka 11.00
U. K. £ 1.10
U. S. $ 2.20

‘……প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করো ……

গেরিলা বাহিনী : রাজনীতি ও পার্টি প্রসঙ্গে

গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে মাও নতুন ভাবনার কথা বললেন।

বললেন : বন্দুক-রাইফেলের পরিবর্তে প্রচার চাই, বিমানের পরিবর্তে চাই বিধ্বংসী ক্রিয়া, মেশিনের পরিবর্তে মানুষ আর অস্ত্র, শিল্পের পরিবর্তে চাই রাজনৈতিক শিক্ষা।

রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে—

গিয়াপ বললেন : It Politics) is the soul of the Army.

রাজনীতি হলো গেরিলাদের প্রাণ।

তুমি মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতি তোমায় বুঝতে হবে—রাজনৈতিক দীক্ষায় তোমায় সুদক্ষ হতে হবে—কেননা তোমার স্বাধীনতার যুদ্ধটাই রাজনৈতিক যুদ্ধ। তাই গোড়ার রাজনীতি তোমার নিকট পরিষ্কার থাকবে—তাহলে ক্লান্তির পাখি ডাকবে না—নিরাশার হাওয়া গায়ে লাগবে না। কেন যুদ্ধ, কী জন্য যুদ্ধ? তোমার দেশ শোষিত হয়েছে, দেশের উপর অত্যাচার হয়েছে, রাজপথে রক্তের বান ডেকেছে, তোমার ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে, তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, ঐশ্বর্যের পিরামিড গড়েছে ওদিকে—এদিকে তোমার খাবার, জীবনের নিরাপত্তা নেই, তোমার পাটের টাকা, চায়ের, চামড়ার, তামাকের টাকায় তারা তাদের দেশে কল গড়েছে, কারখানা তৈরি করেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নত সম্প্রসারণ ঘটেছে। জলসম্পদ তোমার প্রচুর, জলবিদ্যুতের প্রকল্প তোমার দেশে নেই, প্রতি বছর বন্যা আসে, তোমার ঘর ভাসে, চালা ডুবে যায়, তোমার আশার ধান শেষ হয়, বন্যার বাঁধ নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই, কৃষিপ্রধান দেশ তোমার, সেচ-প্রকল্পের ব্যবস্থা

নেই, ওদেশের পাহাড়ী এলাকায় পাথর কেটে জমি তৈরি হলো, বিরাট বিরাট ড্যাম করে জলসেচের ব্যবস্থা হলো, ফসলের সোনালী শীষেরা সেখানে আজ মাথা দুলিয়ে গান গায়, তোমার সোনার দেশ শ্মশান হলো। প্রতিকার চাও—ওরা বলবে: জাতির শত্রু।

প্রতিবিধান চাও—বলবে: বিদেশীর চর।

ন্যায্য অধিকার চাও—বলবে: বিচ্ছিন্নতাবাদী।

ইনসাফ চাও—বলবে: এরা ইসলাম মানে না—ধর্ম মানে না।

ধর্মের নামে শোষণ করবে। বাধা দাও, কারাগারে দেবে। আন্দোলন করো, গুলি করবে। তুমি মুক্তিযোদ্ধা, এসব রাজনীতির কথা তোমার বুঝতে হবে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে, গোড়ার ভুল ধরতে হবে।

মাও বললেন: War is the continuation of politics. তাই যুদ্ধের শুরুর আগেই গোড়ার রাজনীতি তোমায় জানতে হবে। রাজনৈতিক শিক্ষা যুদ্ধ-জয়ের প্রাথমিক শর্ত। এ-শর্ত যদি অবহেলা কর, তোমার দ্বারা দেশের স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ কাজ সম্ভব নয়। তোমার রাজনৈতিক দীক্ষা তোমার চেতনায় বল যোগাবে, তোমার রাজনৈতিক দীক্ষার আদর্শের উদাহরণ জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে মাও লিখলেন: গেরিলারা শুধু যুদ্ধের খাতিরেই যুদ্ধ করবে না; সঙ্গে সঙ্গে তারা জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে, সংগঠিত করবে, সুশিক্ষিত করবে এবং সশস্ত্র করে তুলবে—বৈপ্লবিক রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসবে। এসব উদ্দেশ্য ছাড়া যুদ্ধের কোন অর্থ হয় না আর লালফৌজের টিকে থাকারও কোনও মানে নেই।

গেরিলা যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্য এক হতে হবে—অভিন্ন হতে হবে। একটি ছাড়া অন্যটি চলবে না, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জন সম্ভব নয়। গিয়াস বললেন: Both the political struggle and armed struggle become equally important. শুধু যুদ্ধের খাতিরেই যুদ্ধ নয়, শূধু জয়ের খাতিরেই যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের পেছনে থাকবে বৃহত্তর রাজনৈতিক তাৎপর্য।

পাঠাগার ঢাকা

চে বলেন: এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জোরেই পাবে ব্যাপক গণসমর্থন।

ব্যাপক গণসমর্থন যুদ্ধ-জয়ের কাজকে সহজ করে তরন্বিত এবং ত্বরান্বিত করে।

সেজন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার কঠিন রূঢ়তার সামনে দাঁড়িয়ে মাও লিখলেন: In a word, war cannot, for a single moment. be separated from politics. গেরিলাদের মানস গঠিত হবে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আলোকে, কর্মপদ্ধতি স্থির হবে জনগণের লালিত মানসিকতার আবহাওয়ায়—তার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর আওতায়। জনগণের ঐতিহ্যগত ও লালিত চেতনার সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতি নির্ধারিত হবে। পলিমাটির নরম দেশজ পরিবেশের প্রচ্ছায়ায় গেরিলাদের রাজনৈতিক দীক্ষার সাধনা প্রধাবিত হবে নতুন পথে, নতুন খাদে, নব ভাবধারার ও ভাবনার তীব্রতা নিয়ে। নিজস্ব ভৌগোলিক বিশিষ্টতায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতবাদ অন্য দেশের প্রচলিত থিওরী হতে ভিন্ন হতে বাধ্য। সেই বাধ্যতার ভিন্নতাকে স্বীকার করে নতুন পথে তোমার যাত্রা—নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার নিরলস সাধনায় তোমার সামগ্রিক শ্রম নিয়োজিত, যা তোমার দেশের হৃদয়ের সঙ্গে মিলে যায়—দেশের বিশিষ্টতার সঙ্গে খাপ খায়—যা মানব-কল্যাণের স্বাভাবিক ও সহজ পথ খুঁজে পায়।

তুমি শূধু যোদ্ধা নও, রাজনৈতিক কর্মীও। তোমার পেছনে আছে পার্টির সমর্থন ও সাহায্য, সামনে থাকবে পার্টির কর্মসূচী। বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যই তোমার এই যুদ্ধ। সেজন্য পার্টি তোমাদের জন্ম দিয়েছে, লালন করেছে, সংগঠিত করেছে, রাজনৈতিক দীক্ষায় শিক্ষিত করেছে।

গেরিলাবাহিনী পার্টির অংশরূপে কাজ করবে। পার্টির কর্মসূচী সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা, প্রগাঢ় জ্ঞান, মানুষের প্রতি, জাতির প্রতি সীমাহীন আনুগত্য, পার্টির নিজস্ব অর্থনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ও বাস্তবায়নের জন্য অফুরন্ত ইচ্ছার ত্যাগ, সর্বোপরি রাজনৈতিক বৈপ্লবিক আদর্শ প্রত্যেক গেরিলাকে সহযোগী ও সহমর্মিতার সৌজন্যে গ্রথিত করবে, স্বার্থত্যাগের মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবে, মরণহীন নিঃশঙ্কের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, শপথের জয়মাল্যে ভোরের সূর্য রক্তরাঙ্গা হয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখবে : Resolved to fight, determined to win.

শুধু তুমি যোদ্ধা নও, রাজনৈতিক কর্মীও। রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ হলো প্রচার—পলিটিক্যাল 'মবিলাইজেশন'।

মাও বললেন : The mobilization of the common people throughout the country will create a vast sea in which to drown the enemy create the conditions that will make up for our inferiority in arms and other things and create the prerequisites for overcoming every difficulty in the war. এর সঙ্গে চারিটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করলেন—

(১) * দেশের জনগণকে বুঝতে হবে কেন যুদ্ধ, কিসের জন্য যুদ্ধ, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি—about the political aim of the war. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের এই রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো : পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে বিতাড়িত করা, স্বাধীনতা অর্জন করা। কেননা—মুজিব বলেন : বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছে তখনই তারা (পশ্চিম পাকিস্তানীরা) আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-চক্র কোন দিনও বাঙালীদের হাতে রাষ্ট্র-পরিচালনা ছেড়ে দেয় নি। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সামরিক শাসন, ৯২-ক ধারার প্রয়োগে তেইশ বছর ধরে বাঙালীদের নিকট থেকে

পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী শাসকচক্ররা ছলে-বলে-কৌশলে, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের অগ্নি ছিটিয়ে, দাঙ্গা বাধিয়ে, ধর্ম ও ইসলামের দোহাই তুলে, সৌভ্রাত্রের মেকী অথচ উষ্ণ স্পর্শ লাগিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে ছেড়ে দেয় নি। এবারেও যেহেতু বাঙালীরা জাতীয় পরিষদে একক সাংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলো বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, সেজন্যে এরা সুপরিকল্পিত গণহত্যার ঝুঁকি নিয়েছে--কিন্তু, নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়নি, দেয়নি বলেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য।

(২) ❊ শুধু লক্ষ্যের কথা বললেই হলো না। তার সঙ্গে There must be a political programme. বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বললেন: শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

বললেন: অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত জনতার পাশে আমি আছি, থাকবো।

নেতার এই ঘোষণার বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বেতার ভাষণে বললেন: "সরকার ভূমিহীনকে ভূমিদান, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ, বড় বড় শিল্প জাতীয়করণ করে দেশকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" নির্ভেজাল কম্যুনিজমে যেমন জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়—ব্যক্তিচেতনা ও চিন্তার স্ফুর্তি ঘটে না—তেমনি বুর্জোয়া গণতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কল্যাণরশ্মি সর্বস্তরে বিকীরিত হওয়া সম্ভপর হয়নি। দুয়ের সুষম সমন্বয়ে, ব্যক্তিস্বাধীনতার স্ফুরণে ও অর্থনৈতিক মুক্তির আলোকে—Democratic Socialism-এর পথে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এতে বাধা আসবে ঠিকই, পথের অন্ধকার মুখ বাড়িয়ে ভয় দেখাবে ঠিকই—

অচলাবস্থার কালো মেঘ গর্জন করবে নিশ্চিত—তবু এ পথেই বাংলাদেশ ও বাঙালীর মুক্তি আসবে, জীবনের নবতর আনন্দস্পন্দন ধ্বনিত হবে। তার কারণ হলো, বাঙালীর রক্ত আর তার মানসিক গঠন, উর্বর মাঠের আয়েসী শ্রমের অফুরন্ত সম্পদ, জলো হাওয়া, পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দুঃসাহসিকতা, আর্দ্র আবেগ-কম্পিত হৃদয় আর তার সাথে স্বপ্নরঙিন ধানসিঁড়ি নদীর বাংলাদেশ—দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতি আর আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পৃথিবীর জাতি থেকে আপন গৌরবে করেছে অভিষিক্ত, সংগ্রাম করেছে সংহত, অর্থনৈতিক শোষণে করেছে তীক্ষ্ণ। তাই জাতীয়তাবাদ, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধের দীপ্তিতে Democratic Socialism হলো তার পথ। আর এ পথই হলো পার্টির নির্দিষ্ট পথ—রাজনৈতিক কর্মসূচী, Political programme.

(৩)❋ কেমন করে জনগণকে 'মবিলাইজ' করা যাবে? বক্তৃতা দিয়ে, প্রচারপত্র বিজ্ঞাপন বিলি করে, সংবাদপত্র বিতরণ করে, মুক্তিসংগ্রামের পুস্তক প্যাম্পলেট ছড়িয়ে ও পড়িয়ে। এগুলো ব্যতীত স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিদিনই জনগণের মনের গোপন স্তরে স্বাধীনতার মর্মবাণী স্থাপন করছে, সেজন্য জনগণকে স্বাধীন বাংলার বেতার শোনবার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা।

(৪)❋ শুধু একবার জনগণকে 'মবিলাইজ' করলেই কি মবিলাইজেশন সম্পূর্ণ হয়ে যায়? মাও বললেন: To mobilize once is not enough.

সেজন্য, তোমায় জলের মত ঘুরে ঘুরে জনগণের কানের কাছে কথা বলতে হবে—বলতে হবে যুদ্ধের অগ্রগতির কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা, রাজনৈতিক কর্মসূচীর কথা।

গিয়াপ বললেন: Political work is party work and work of mass mobilization of the party in the army.

পার্টির সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের—মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পার্টির

সম্পর্ক সঠিকরূপে পরিচালনা ও সমন্বয়সাধনের জন্য গেরিলাবাহিনীর গ্রুপের ও প্লাটুনের সঙ্গে পার্টির গ্রুপ ও ব্রাঞ্চ থাকবে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ গেরিলা-কার্য পরিচালনার জন্য পার্টি থানা বা ইউনিয়নভিত্তিক আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্টি গঠন করবে—যারা জনগণের সহযোগিতায় হানাদারবাহিনীর তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে বিকল্প সরকার-রূপে কার্য পরিচালনা করবে। যে-কোন গেরিলা ইউনিট যে-যে অঞ্চলে প্রবেশ করবে সেই সেই অঞ্চলের পার্টিপ্রধানদের নিকট তাদের উপস্থিতি-সংবাদ, গোপন রিপোর্ট পেশ করবে। পার্টিপ্রধান গেরিলাদের ঘাঁটি, খাদ্য, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। এবং অপারেশন-টার্গেট নির্ণয়ে গেরিলা ইউনিটের প্রধান এবং পার্টিপ্রধান আলোচনা করবেন। পরিবেশ, পরিস্থিতি কমিউনিকেশন, অন্যান্য সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বিচার করে গেরিলা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করবেন। এবং তা কোরিয়ারের মাধ্যমে প্রধান গেরিলা ঘাঁটিতে প্রেরণ করবেন। সেজন্য ভিয়েতনামে গেরিলাযুদ্ধের এই ধারা সম্পর্কে গিয়াপ লিখলেন : We have set up, parallel with the system of command, a system of political commissar's, in line with the principle that the command and the political commissar are both heads of the unit.

গেরিলা ইউনিট-প্রধান কমাণ্ডার পার্টির নির্দেশ মেনে চলবেন আর পার্টিপ্রধান যেহেতু পার্টির অন্যতম অঙ্গ, সে হিসাবে পার্টিপ্রধানের নির্দেশ গেরিলা ইউনিট প্রধান সম্মান করবেন, পারস্পরিক যৌথ প্রচেষ্টায়ও সেজন্য তাঁরা পার্টির কর্মসূচীকে দেশের মাটিতে গ্রথিত করবেন। কেননা Party is the founder, organiser and educator of the army. চীনে ও ভিয়েতনামে এভাবে কাজ করে পার্টির সঙ্গে সেনাবাহিনীর, সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাটির প্রয়াস সুচারুরূপে যুক্ত হয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্কহীনজনিত অসৌজন্যের গুমোট আবহাওয়া হতে পরিত্রাণের সুফল পাওয়া গেছে।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

দেশের অভ্যন্তরে গেরিলাবাহিনীর জন্য পকেট তৈরি, তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্যের সংস্থান করার দায়িত্ব পার্টির। তুমি গেরিলা—পার্টির সঙ্গে তোমার আত্মার যোগ থাকবে, পার্টিপ্রধানের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা তোমার কর্তব্য—পার্টির কমাণ্ড মেনে চলো—পার্টির উপর কন্‌ফিডেন্স রাখো, পার্টির ম্যাণ্ডেটকে তুলে ধরো। তোমার প্রতিটি কাজের ভেতর দিয়ে, তোমার প্রতিটি আচরণের আর ইঙ্গিতের, চলাফেরার আর কথাবার্তার ভেতর দিয়ে পার্টির নীতি ও বৈপ্লবিক আদর্শ প্রতিফলিত হবে। নিষ্ঠা আর শৃঙ্খলা পরিস্ফুট হবে।

……আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো……

কৌশল ও রণনীতি প্রসঙ্গে

স্থির জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ ট্যাক্‌টিকসের ফর্মুলায় গেরিলা যুদ্ধ নির্মল আকাশ নয়—বরং পরিবেশের পরিবর্তনে থেকে থেকে তার রঙ বদলায়, ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ ধরে। কখনো সূর্যের প্রখর দীপ্তিতে হয় রক্তিম তীক্ষ্ণ, কখনো ভোরের আলোর হাসি নিয়ে সে হয় কৌশলের চতুর পাখি, কখনো চাঁদের মোম-গলা আলোর প্লাবনে সে হয় রহস্যের নদী। গেরিলা যুদ্ধের রীতি আছে কিন্তু সে রীতির শেষ নেই, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল আছে কিন্তু সে কৌশল প্রয়োগের সীমায়িত অভিজ্ঞতায় নিঃশেষিত নয়। সে এক চতুর পাখি—নতুন নতুন ডালে নতুন কথা—নতুন মরশুমে অভিনব কথা—নতুন হাওয়ায় রূপান্তরিত কণ্ঠস্বর। মাও বললেনঃ Guerrilla warfare will not remain the same throughout this long and cruel war. তার রীতির পরিবর্তন আছে, কৌশলের বিবর্তন আছে। তবু প্রচলিত কৌশল প্রসঙ্গে চে বললেনঃ পথের ধারে বসে থাকো ওৎ পেতে, সংগোপনে ; শত্রু আসলে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো বাঘের শক্তি ও তীব্রতা নিয়ে। য়্যামবুশ করো নিকট থেকে—অব্যর্থ লক্ষ্যে। শেষ জীবিত শত্রুও যেন ফিরে যেতে না পারে। য়্যামবুশের সুবিধে আছেঃ শত্রু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পায় না। অস্ত্র গোলাবারুদ সবই তোমার হাতে আসবে। য়্যামবুশ কিন্তু সহজ নয়। শত্রু বিচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করে না—দল বেঁধে যায় তারা। একদল আক্রান্ত হলে অন্য দল পাল্টা আক্রমণ করে। জনসংখ্যায় এবং অস্ত্রবলে তারা বলীয়ান। সেজন্য কোন্ পথে শত্রু যায়—কখন ও কিভাবে যায়, কতজন কি নিয়ে যায় তার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করো। স্থান নির্ধারণ করো—জনগণ

যেখানে তোমার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন সেখানে—আত্মগোপনের এবং দ্রুত পলায়নের ব্যবস্থা আছে যেখানে। তারপর য়্যামবুশ করো সঠিক ও অব্যর্থ লক্ষ্যে।

কিউবার গেরিলাদের কৌশলগত দিক সম্পর্কে ফিদেল বললেন ঃ পথের ধারে লুকিয়ে, ঘাসের বনের পাশের পথে লুকিয়ে আক্রমণ করো ঃ রোড য়্যামবুশ। পথে হেঁটে যাও—যাওয়ার পথে, পথে টহল দিতে দিতে আক্রমণ করো—রেইডিং প্যাট্রোলস্। শত্রু এলাকায় ইঁদুরের মত ঢুকে পড়ো, প্রচার চালাও, শত্রুর মনে ফাটলের গর্ত তৈরি করো — ইনফিলট্রেশন। শত্রুকে আক্রমণে বিধ্বস্ত করো—তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে একত্র করো এবং করো অবরোধ ঃ সাসটেইণ্ড সীজ।

এই চার রকমের কৌশল প্রয়োগ করো চতুরতার সঙ্গে—দ্রুততার সঙ্গে, নিঃশব্দ সতর্কতায়। এতে লোক অল্প লাগছে ঃ দায়দায়িত্ব থাকছে কম আর ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকছে প্রচুর পরিমাণে।

স্ট্রেটিজিক ডাইরেকশন সম্পর্কে ভিয়েতনামের কেন্দ্রীয় কমিটি বললেন ঃ dynamism initiative, mobility and rapidity of decision in face of new situation. এই নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিয়েতনামে রণকৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রথম দিকের রণকৌশল ছিলো ঃ বাঁশের সূচালো খোঁটা দিয়ে প্রতিরোধাত্মক তৎপরতা। অর্থাৎ শত্রুকে গৃহ অথবা বাগিচায় প্রবেশ করতে না দেওয়া।

তারপর এলো—গ্রামের প্রবেশ-পথগুলোতে সূচালো খুঁটিযুক্ত ফাঁদ পাতা এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য ছোটখাটো সংঘর্ষ। এতে শত্রুকে গ্রাম থেকে দূরে রাখা এবং নেহাৎ গ্রামে এসে পড়লে সার্থকভাবে আঘাত হানা—এই কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তারপর শুরু হলো ঃ শত্রুকে একস্থানে শক্তি সংহত করতে না দেবার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে গেরিলা তৎপরতা শুরু করে শত্রুকে বিভিন্ন দিকে টেনে আনা। তারপর যখন শত্রুরা গ্রামের পথে পা বাড়াতো তখন পথেই তাদের আঘাত হানবার জন্য প্রয়োজন পড়লো

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

ফ্রন্টের আঞ্চলিক বাহিনীর। এমনি করে পরিস্থিতির পরিবর্তনে রীতির পরিবর্তন হলো—হলো কৌশলের পরিবর্তন।

দ্রুত নৈশ আক্রমণের কৌশল ততটা কার্যকর ছিলো না। কারণ—আক্রমণকারীদের খুঁজে বার করবার জন্য পরদিনই পাঠানো হতো বিরাট বিরাট হেলিকপ্টার বাহিনী। সে সময়টা ছিলো ফ্রন্টের সঙ্কট-কাল। এই সংকটের সমাধান খুঁজে পাওয়া গেলো আপ-বাক-এর লড়াই-এ। আপ-বাক-এর লড়াইয়ের ফ্রন্টের ঘাঁটিগুলো ছিলো এক মাইলের উপর লম্বা ও ৩৫০ গজ চওড়া মাটির নীচে। তার সাথে যুক্ত বহু পরিখা নারকেল বাগান ও বাঁশবনের মধ্যে পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। যতক্ষণ শত্রুর প্রথম লাইনটি কয়েক গজের মধ্যে এবং শেষ লাইনটি গুলির আওতায় না এলো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ গুলি চালায় নি। প্রতিটি আক্রমণ তারা প্রতিহত করেছে কৌশলে, ট্যাংক-গুলো ধ্বংস করেছে ইস্পাতধারী দল। ৩৭ এম. এম. ভারী মেশিনগুলো অব্যর্থ লক্ষ্যে হেলিকপ্টারকে দিলো সাবাড় করে। শত্রুদল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম পর্যায়ে আক্রমণ করলো ঃ পর্যুদস্ত হলো—পিছু হটলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। সেদিন রাত বারোটায় গেরিলারা সে স্থান ত্যাগ করলো। পরদিন ভোর থেকে কামান দেগে, বোমা ফেলে দিয়েমী সৈন্যরা পরিখায় ঢুকে দেখলো কেউ নেই! এ-এক কৌশল! বিভ্রান্ত করার নয়া কৌশল!

মাও বললেন ঃ

শত্রুরা এগিয়ে আসে, আমরা পিছিয়ে যাই!
শত্রুরা থামলেই আমরা তাদের উত্যক্ত করি!
শত্রুরা ক্লান্ত হলে আমরা তাদের আক্রমণ করি!
শত্রুরা পিছু হটলে আমরা তাদের ধাওয়া করি!

"The enemy advances, we retreat ; the enemy camps, we harass ; the enemy tires, we attack, the enemy retreats, we pursue" তুমি মুক্তিযোদ্ধা—মৃত্যু তোমার সামনে—কিন্তু আত্মরক্ষা তোমার ধর্ম। আত্মরক্ষার অর্থ পলায়ন নয়, কার্যসিদ্ধি করে নিরাপদ

স্থানে ফিরে যাওয়া। একশত পেশাধারী সৈন্যের সমান তুমি—তুমি মরলে একশত শত্রুকে মোকাবিলা করার লোকের অভাব হলো। গেরিলাজীবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজকে খাপ খাইয়ে নাও—দেখবে আত্মরক্ষার কৌশল তোমার আয়ত্তে এসেছে।

শুধু প্রতিরক্ষা আর পলায়নের নীতি সব সময় কার্যকরী হয় না। এ-নীতির দ্বারা আত্মরক্ষা ও শত্রুধ্বংসের মূল উদ্দেশ্য ঠিকমত সিদ্ধ হয় না। এজন্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। হঠাৎ আক্রমণ করে শত্রু ধ্বংস করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা একই সঙ্গে করতে হবে। এটা হলো Hit-and-run Policy.

চে বললেন: শত্রু আসছে আমরা পালাচ্ছি। আমাদের পেছন পেছন ছুটে আসছে কামানের গোলা—কামান দাগতে দাগতে তারা আমাদের তাড়িয়ে আনছে। হঠাৎ থামলো তাদের গতি। আমরা জানি, গতি রুদ্ধ হবেই। আশ্চর্য হবেন না আমার কথা শুনে। শত্রু ছুটছে—কিন্তু তারা জানে না তাদের জন্য পাতা রয়েছে সংগোপনে মরণ-ফাঁদ। আমাদের কর্মধারা অসীম, তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুতরাং রিট্রিট-এর অর্থ পলায়ন নয়। বরং শত্রুকে টেনে এনে ফাঁদে ফেলে কৌশলে নির্মূল করার পদ্ধতি। মাও বললেন : রিট্রিট্ প্রয়োজন।

The object of strategic retreat is to conserve military strength and prepare for the counter-offensive.

যখন শত্রুরা তোমাদের ঘিরে ফেলবে—ছত্রভঙ্গ হয়ে কেটে পড়বে।

যখন দেখবে, প্রাকৃতিক পরিবেশ তোমাদের অনুকূল নয়, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

যখন দেখবে, সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে—কেটে পড়বে।

যখন দেখবে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কাজ করতে হবে—বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়বার জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

যখন দেখবে, শত্রুরা ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছে—আক্রমণ করার মত অবস্থা নেই—কেটে পড়বে। ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করবে। তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেবে।

যখন দেখবে কোন শহর বা ঘাঁটিকে নিরাপদে দখলে রাখা সম্ভব নয়, তখন তা ছেড়ে যাবে।

যতদিন দেখবে তোমার থেকে শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রের পরিমাণ বেশী ততদিন গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। গিয়াপ বললেন : Strike to win, strike only when success is certain ; if it is not, then don't strike.

যখন দেখবে চূড়ান্ত সাফল্য তোমার হাতের মুঠোয়, কেবল তখনই নিয়মিত সৈন্য গঠন করে প্রতি-আক্রমণের ব্যবস্থা করবে।

মাও গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি নির্ধারণ করলেন :

❋ গেরিলা যুদ্ধে সব সময় রক্ষণশীলতাকে বাধা দিতে হবে।

❋ সব সময় নিজেদের গা বাঁচিয়ে শত্রুদের ধ্বংস করতে হবে।

❋ গেরিলা ও নিয়মিত যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণ ও প্রকাশ-ভঙ্গিমাগত।

❋ মুক্তাঞ্চল বা ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে।

❋ ভ্রাম্যমাণ যুদ্ধরীতি গড়ে তুলতে হবে।

❋ সেনানায়কদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

❋ গেরিলা যুদ্ধের আর একটি মূলনীতি হলো আক্রমণাত্মক নীতি।

আগে ছোট ছোট শহর দখল করো। কেননা সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পরে বড় বড় শহর দখলে হাত দেবে। অযথা শক্তিক্ষয় করবে না।

চে বললেন : যুদ্ধের প্রথম স্তরে ধনীদের কম বিরক্ত করতে হবে—গরীবদের সাহায্য করতে হবে : helping the poor always and bothering the rich as little as possible in the first phases of war.

অসুবিধে দেখছো—যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটে এসো, যুদ্ধ করতে করতে শত্রুদের সুযোগ দাও; তারা উৎসাহ আর সাহস নিয়ে আক্রমণ করুক—বোকা বকসারের (boxer) মত ঃ এগিয়ে আসুক আর ক্লান্ত হোক ঃ The clever boxer usually gives a little ground at first, while the foolish one rushes in furiously and uses up all his resources at the very start, and in the end he is often beaten by the man who has given ground. তাদের অপরিচিত অঞ্চলে টেনে আনো—টেনে এনে আঘাত করো এবং নিঃশেষ করে দাও।

কিউবার বিপ্লব গেরিলাদের জন্য তিনটি শিক্ষা রেখে গেছে।

- জনগণের শক্তি যে-কোন সৈন্যদলকে পরাস্ত করতে পারে।
- বিপ্লব নিজেই তার পথ কেটে নেয়। বিপ্লবের জন্য বসে থাকার প্রয়োজন নেই—বিপ্লব একবার শুরু হলে তার পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়।
- অনুন্নত দেশে গ্রামদেশই হলো সশস্ত্র সংগ্রামের উপযুক্ত পটভূমি।

চে বললেন ঃ প্রথাগত পুরনো সৈন্যবাহিনী সমাজ-বিপ্লবে অথবা বৈপ্লবিক যুদ্ধে অচল। তাদের মানসিক গঠন স্থিতিশীল প্রথায় আচ্ছন্ন—ডাইনামিক প্রসেস তাদের উপলব্ধির সীমায় আসে না।

তিনি বললেন ঃ গেরিলাবাহিনীর নেতৃত্ব করবে অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধারা—শহরের আমলাতান্ত্রিক অফিসাররা নয়। কিউবার গেরিলাদের মূলমন্ত্র ছিলো ঃ কোন ক্ষেত্রে তারা গুলি করা শুরু করলে আর থামতো না। গুলি করতে করতে শত্রুদের প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করতো না। যতক্ষণ বুলেট থাকতো ততক্ষণ গুলি করে যেতো—থামতো না। গুলি করতে করতে এগিয়ে যেতো। তাদের এই লৌহকঠিন মনোভাব দেখে শত্রুরা পালিয়ে বাঁচতো।

ফিদেল বললেন ঃ গেরিলাদের বিশ্রাম নেই—আরাম নেই। সুযোগ পেলে গেরিলারা আয়েসি হয়ে উঠবে। সেজন্য গেরিলাবাহিনীকে যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া উন্মত্ততারই সামিল ;

A guerrilla contingent that agrees to a trance in fighting is condemned to defeat.

মালয়ের গেরিলারা অবশ্য অন্য মত পোষণ করেন। তাঁরা বললেনঃ সাময়িক ভাবে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে হবে। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে যে-অংশটুকু পাওয়া যাবে সেখানে বিপ্লবের ঘাঁটি জোরদার করে তুলতে হবে এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাঁরা আরো বললেনঃ শুধুমাত্র অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই চলবে না—সীমানাকে বিস্তৃত করতে হবে। বিপ্লবী কাজ ও প্রচার অবিশ্রান্তভাবে চালাতে হবে দখলদার এলাকায়। সেখানে বিপ্লব শুরু করার পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং বৈপ্লবিক আদর্শ জনগণের ভেতরে সঞ্চারিত করতে হবে।

মালয়ের গেরিলারা বৃটিশদের তাড়ানোর জন্য তিনটি স্তরের এক পরিকল্পনা তৈরি করেঃ

❋ দেশের জনগণকে সন্ত্রস্ত করে তোল। তাদের ভেতর নিরাপত্তার অভাব জাগিয়ে তোল। সারা দেশে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করো যাতে সরকারের উপর জনগণের আস্থা না থাকে।

❋ যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করো—যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করো—অচল করো; কয়েকটি অঞ্চল দখল করো—ঘাঁটি বানাও; সাময়িক ঘাঁটি থেকে পরবর্তী ঘাঁটি তৈরির জন্য এগিয়ে যাও।

❋ অধিকৃত অঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হাতে তুলে নাও। গেরিলা ইউনিটকে সেখানে নিয়মিত স্থানীয় সরকারী সৈন্যদলে পরিণত করবে। সাময়িক ঘাঁটিকে স্থায়ী ঘাঁটিতে রূপ দেবে।

সর্বদা চক্রাকার আঞ্চলিক বিপ্লবের পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে। কোন এক জায়গায় গেরিলা যুদ্ধ সফল হলেই সেই স্থানকে কেন্দ্র করে বেল্‌ট বা রিং তৈরির কাজে হাত লাগাতে হবে। অধিকৃত এলাকার সুবিধা এবং সাহায্য নিয়ে আশেপাশের জায়গায়

গেরিলা যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। একটি মশাল থেকে যেমন অজস্র মশাল জ্বলে তেমনি বিপ্লবের অগ্নিকণার শত ধারাকে ছড়িয়ে দাও।

শত্রু শক্তিশালী, সংহত একই জায়গায়, আঘাত করার সুযোগ নেই, কাছে যাবার সুবিধে নেই কিংবা কাছে গিয়ে আঘাত করলে তোমারই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে তোমার ট্যাক্‌টিকস্‌ হবে।

গিয়াপ বললেন : Our strategic line was to extend guerrilla warfare everywhere. দেশের সর্বত্রই গেরিলা তৎপরতা শুরু করে দাও।

দেখবে, শত্রুরা ছুটে আসবে তোমার অঞ্চলে, তোমাকে শায়েস্তা করতে ছাউনি ফেলবে, ঘাঁটি বানাবে। তখন শত্রুকে আঘাত করার কাজ সহজ হয়ে আসবে। শত্রুদের দুর্বল ঘাঁটিতে আঘাত করো। আঘাত করো তোমার সুবিধেমত স্থান থেকে—শত্রুর দুর্বলতম জায়গায়।

গিয়াপ বললেন : এতে সুবিধে হবে—

As a result, the more we fought, the stronger we became.

বাংলাদেশে লক্ষ্য করা গেছে, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যেখানে সফল ও হানাদার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি যেখানে ব্যাপক, সেখানে পরবর্তীকালে তারা কেন্দ্রীভূত আক্রমণ পরিচালনা করেছে—নগর-গ্রাম-জনপদকে ধ্বংস করেছে নির্বিচারে, আগুন দিয়েছে, হত্যা করেছে, রেপ করেছে তথা অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা বইয়ে দিয়েছে সেখানে। জনসাধারণ অসহায় আর্তনাদে আক্ষেপ করেছে। মুক্তিবাহিনীর 'Hit-and-Run policy'র প্রতি অনাস্থা ও বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশেষ গেরিলা ট্যাক্‌টিকস্‌ বাংলাদেশে আর তেমন কার্যকর হয়ে উঠছে না। বরং এতে জনমত ধীরে ধীরে বিকল্প ভীতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সে দিকে লক্ষ্য রেখে গেরিলাদের

ট্যাক্‌টিকস্‌ পরিবর্তন অনিবার্য। Mobile warfare-এর রণনীতিগত কৌশল সেখানে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গেরিলা যুদ্ধকে চলমান যুদ্ধ (Mobile warfare)-এ পরিবর্তিত করতে হলে, একদিকে যেমন গেরিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, ছোট ছোট গেরিলা ইউনিটকে একত্রীভূত করে একই আঞ্চলিক single command-এর অধীনে এনে, অন্যদিকে তেমনি গুণগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতিসাধন করতে হবে। অবশ্য, ইউনিটগুলোকে একত্রীভূত করার অর্থ এই নয় যে, নির্ধারিত অঞ্চলে যেখানে যে-ইউনিট তার পরিকল্পিত কার্যে নিয়োজিত ছিলো তা থেকে সরিয়ে আনা বরং তার পরিকল্পিত কার্য সম্পাদনের অঙ্গ হিসেবে তারা স্থানীয় জনগণের মানসিকতার নিরাপত্তা হিসেবে 'চলমান যুদ্ধে' অংশগ্রহণ করবে।

মাও বললেন : চলমান যুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের বিকাশ গেরিলা যুদ্ধকে বর্জন করা নয় বরং বহুবিস্তৃত গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে চারধারে বহুসংখ্যক গেরিলা ইউনিট সমন্বিত হয়ে তখনও ব্যাপক গেরিলা সামরিক কার্যকলাপের মধ্যে চলমান যুদ্ধ পরিচালিত করে যাচ্ছে যে-প্রধান বাহিনী, এসব তারই ক্রমসংগঠন। এসব গেরিলা ইউনিট হচ্ছে প্রধান বাহিনীর শক্তিমান সহায়ক বাহিনী এবং প্রধান বাহিনীর অব্যাহত বৃদ্ধির পক্ষে অফুরন্ত সঞ্চয় ভাণ্ডার। সেজন্য মাও লিখেছেন : গেরিলা ইউনিটগুলোর গুণগত মানের উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্যকর্ম হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক এবং রণসম্ভার, সামরিক প্রযুক্তি বিষয়, রণকৌশল ও শৃঙ্খলাজ্ঞান, এমনভাবে উন্নত করা যাতে তারা নিজেরাই গেরিলারীতি পরিহার করে নিয়মিত বাহিনীর আদর্শে নিজেদের গড়ে তোলে।

আর এই নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে গেরিলাদের উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, (স্টাফ, কর্মপদ্ধতি, সরবরাহ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা, রণসম্ভার, অস্ত্র, যোগাযোগ),

সামরিক প্রয়োগ ও কৌশলের ক্ষেত্রে গেরিলা ইউনিটকে নিয়মিত সংস্থার স্তরে উন্নীত করতে হবে। কেননা, গেরিলা যুদ্ধ দ্বারা শত্রু-হনন সম্ভব, তাকে ব্যতিব্যস্ত করা সহজ, তাকে বিব্রত করা সুবিধে-জনক, কিন্তু হানাদারবাহিনীর হাত হতে স্বদেশের মাটিকে চিরতরে মুক্ত করা ও নিশ্চিত নিরাপত্তার জন্য চাই নিয়মিত বাহিনী।

সেজন্য এ লক্ষ্য সামনে রেখে সংঘর্ষের বাস্তব, তিক্ত ও রক্তাক্ত প্রান্তরের উপর দাঁড়িয়ে আজকে গেরিলাদের অঞ্চলবিশেষে ও পরিবেশের প্রভাবে এগিয়ে যেতেই হবে হানাদারবাহিনীর সঙ্গে ছোটোখাটো খণ্ড সম্মুখযুদ্ধে। কোন বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত আক্রমণের মুখে অবশ্যই প্রতি-আক্রমণের ঝুঁকি নিতে হবে। সে-ক্ষেত্রে চাই সুপরিকল্পিত কার্যকর কর্মসূচী—যার মাধ্যমে তোমার এলাকার প্রতিটি গেরিলা ইউনিটকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে, যাতে শত্রু নির্দিষ্ট আক্রমণ-স্থলে পৌঁছানোর আগেই য়্যামবুশে পড়ে অতর্কিতে, মাইন বিস্ফোরণে তার যানবাহন যেন ধ্বংস হয়, আক্রমণ স্থানের বহু দুরেই যেন সে বার বার আক্রান্ত হয়—বিধ্বস্ত হয়। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেন, এ পরিস্থিতিতে অর্ধপথে তার পশ্চাদপসরণ অবশ্যম্ভাবী, সে ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই শত্রুর পলায়নের পথে আক্রমণ করতে হবে এবং তাদের ধ্বংস করে দিতে হবে। একটি শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাকে অবশ্যই স্থানপরিবর্তন করতে হবে নতুন শত্রুবাহিনীর আগমন-আশঙ্কায় এবং সতর্ক থাকতে হবে নতুন উদ্যম নিয়ে।

এমনি করে গেরিলা ইউনিটের আঞ্চলিক একত্রীভূত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং কার্যকর পরিকল্পনা ও প্রয়োগের মাধ্যমে থানা, মহকুমা বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেশকে হানাদার-মুক্ত করা সম্ভব। আর তার জন্য প্রয়োজন: শত্রুকে ভুল বোঝানো, প্রলোভনে ফেলা, বিভ্রান্ত করা; নয়া কৌশলের মাধ্যমে নিত্য নতুন ফাঁদ বিস্তার করা: যেমন, ভানটি হবে পূর্ব কিন্তু আক্রমণ হবে পশ্চিম

থেকে, হঠাৎ উত্তরে আবার একটুতেই উত্তরে—আঘাত হেনেই সরে পড়া।

পাঠাগার
ঢাকা

সরে পড়ো নিশ্চিত নিরাপদ ঘাঁটিতে।

সেজন্যে গেরিলা ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে।

ঘাঁটি এলাকাগুলো কি ?

মাও বললেন : এগুলো হচ্ছে রণনীতিগত ঘাঁটি যার উপর নির্ভর করে গেরিলাবাহিনী রণনীতিগত কর্তব্য পালন করে এবং শত্রু নিধন ও শত্রু বহিষ্করণের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য প্রতিপালিত করে থাকে। এই ধরনের রণনীতিগত ঘাঁটি ব্যতীত আমাদের কোন রণনীতিগত কর্তব্য সমাপন বা যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ভর করবার মত কিছুই থাকবে না। ঘাঁটি এলাকা, বস্তুত, গেরিলাবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভূমি।

পার্বত্য অঞ্চলে স্বভাবতই শত্রুর সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শত্রুর পশ্চাতে বসে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা সহজ। প্রতিরোধ সংগ্রামে চীনের, আলজিরিয়ার, ভিয়েতনামের বা কিউবার গেরিলারা প্রাথমিক স্তরে পার্বত্য অঞ্চলকেই অধিকতর সুবিধাজনক স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলো। তার অর্থ এই নয় যে, সমতলভূমিতে বা নদী-মেখলা অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা কিংবা ঘাঁটি নির্মাণ অসম্ভব।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-সিলেট এলাকায় ছোটখাটো পাহাড় রয়েছে—রয়েছে বিস্তৃত সুন্দরবন, ভাওয়াল-মধুপুর গড়, রয়েছে নোয়াখালী, পাবনা-খুলনা-বরিশাল, ফরিদপুর তথা বিস্তৃত এলাকায় পদ্মা-মেঘনা-যমুনার অকৃপণ বারিরাশির করুণা-ধারার মোহনা। যারা তাই প্রাকৃতিক-পরিবেশের অজুহাত তুলে বলেন : বাংলাদেশের সমতলভূমি গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে উপযোগী নয় তাদের সঙ্গে তোমার মতৈক্য হবে না। কেননা, বিস্তৃত নদীমোহনা, যাতায়াত অযোগ্য অগুণতি চরমালা, ছোটখাটো পাহাড়ী এলাকা, বনভূমি গেরিলাদের

বিচরণের পক্ষে উৎকর্ষ। শত্রু যখন তার দখলকৃত এলাকা রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে, তখন আক্রমণের পাল্টা ধাক্কায় সমতলভূমির ঘাঁটিকেই তা সহ্য করতে হয় প্রথমেই। সেজন্য একেবারে সমতলভূমিতে গেরিলাদের স্থায়ী ঘাঁটি অসম্ভব। সমভলভূমিতে বৃহৎ গেরিলা সংগঠনগুলো বহুদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অক্ষম—সেজন্য সমতলভূমিতে গেরিলাদের যুদ্ধরীতি হবে, মাও বললেন : Fluid way of fighting, অর্থাৎ স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘাঁটি সরিয়ে যুদ্ধ করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া, বাংলাদেশের ধানঝোপের আড়াল হতে, কাশবনের আচ্ছাদনে ঢেকে, পাট-ইক্ষু ক্ষেতের ও রবিশস্যের আড়াল থেকে গেরিলা যুদ্ধ ও আক্রমণ সম্ভব। বাংলাদেশে মরশুমী গেরিলা-যুদ্ধ সবচেয়ে উপযোগী। কেননা, বর্ষায় নদীতে বান ডেকে ওঠে, তার ভয়াবহ গর্জন, অবিরত বৃষ্টির সঙ্গীতধারা, কাদামাটি, কীটপতঙ্গ আর্দ্র আবহাওয়া, সবকিছুই মিলে পশ্চিম পাকিস্তান হতে আগত হানাদারবাহিনীকে সমূহ অসুবিধার বিবরে টেনে নেয়। বর্ষার এই মাসগুলো অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র এবং আশ্বিন মাস বাংলাদেশে গেরিলাদের মাস। গেরিলারা তখন ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলবে, ডুবে চলবে এবং লুকিয়ে চলবে। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর মানসিক যাতায়াত এবং পরিবেশগত অসুবিধা এই মাসগুলো গেরিলা-কার্যকলাপের জন্য ফলপ্রসূ সময়। তোমায় এই মাসগুলোর সুবিধাকে ব্যাপকভাবে এবং সার্থকভাবে ব্যবহার করতে হবে—নইলে স্বাধীনতা-যুদ্ধ ইপ্সিত সময়ে অর্জিত হতে পারে না। শীতকালীন রবিশস্যের সময়ে বাংলাদেশের উর্বর সমতল মাঠে বুক মাথা সমান করা রাই-সরিষার ক্ষেতে, কলাই-খেসারী-গম-তিসি-যব ক্ষেতের আড়ালে কামোফ্লাজ করে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ চলতে পারে—চলতে পারে নদীপথে ধূমায়িত কুয়াশার আব্ছা-আঁধারকে সামনে রেখে। অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন এ কয় মাসও গেরিলাদের মাস। বাংলার বিস্তীর্ণ মাঠের 'সবুজ পর্দার' সুবিধায় গেরিলারা

সমতল অঞ্চলে তাদের পরিকল্পিত ও নির্ধারিত অপারেশনসমূহ কার্যকর করতে পারে। বাংলাদেশে এই নয় মাস গেরিলা কার্যকলাপ চালানো অধিকতর সুবিধাজনক।

ভিয়েতনামের 'দিয়েন বিয়েন ফু'র ঐতিহাসিক সাফল্যের পেছনেও ছিলো কার্যকর আক্রমণ করার সঠিক সময় নির্ধারণের নির্ভুলতা। মূলত প্রাকৃতিক গঠন, জলবায়ু-আবহাওয়া, মৌসুমী ও মরশুমী সুবিধাকে সামনে রেখেই চূড়ান্ত আঘাত হানার সময়সূচীকে ব্যাপক গেরিলা তৎপরতার মাধ্যমে সার্থক কার্যকর করে তুলতে হবে। না হলে এ ভুলের মাশুলে বৃথাই বহু রক্তের নদী হবে।

ভিয়েতনামে অদ্ভুত কৌশলে হানাদার সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখে গ্রামের বৃদ্ধারা। সবাই গা ঢাকা দিলেও বৃদ্ধারা পালায় না। শত্রু-সৈন্যরা আসলে বৃদ্ধা কান্নার আবেগ নিয়ে বলেঃ সারা এলাকায় ভিয়েতকংরা বর্শার মতো বাঁশের খুঁটি পুঁতে রেখেছে! তোমাদের মত সুন্দর স্বাস্থ্যের যুবকরা ওদিকে যেও না—ফাঁদে পড়ে পেটগুলো যদি ফেঁসে যায় তা হলে খুব দুঃখের!

অথচ ঐ বৃদ্ধাই হয়তো সারারাত বসে বসে বাঁশের ডগা তীক্ষ্ণ বর্শার মত করে ফাঁদ পেতে রেখেছে।

অনেক সময় শুধুমাত্র বুদ্ধির কৌশলে সফল অভিযান পরিচালিত হয়েছে। একটি ঘাঁটি অবরোধ করা হলো। বলা হলোঃ মৃত্যু নয়, জীবনের রাস্তা বেছে নাও, বেছে নাও ন্যায়েরপথ, অন্যায়ের নয়; আত্মসমর্পণ করো। ভিয়েতকংদের একটি কাকশান হাতে, মাত্র একটি কার্যকর অস্ত্র। কিন্তু এমন ভান করলো তারা যেন ঘাঁটিটিকে ঘিরে ফেলেছে। জোরে জোরে বলতে লাগলোঃ 'সেকশান ওয়ান' পাশের দিকে সরে যাও; সেকশান টু—সড়কটাকে পাহারা দাও; সেকশান থ্রি—ডাইনে এগোও; ওরা ভাবল ওদের বুঝি ঘিরে ফেলা হয়েছে।

সেজন্য সংকল্পে দৃঢ়, ভয়কে জয় করে নির্দ্বন্দ্ব সাহসিকতার উপস্থিতবুদ্ধির সার্থক প্রয়োগে নিত্য নতুন কৌশল ও ট্যাকটিক্সের

উদ্ভাবনায় ও বাস্তব কার্যকর পদ্ধতিতে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে বিজয়-সীমান্তে উপনীত হবার জন্য।

একই সময়ে ও সাথে বাংলাদেশের সমস্ত থানাগুলো আক্রমণ করে দখল করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি থানা দখল করে হানাদার বাহিনীর পক্ষে আবার নতুন উদ্যমে সম্ভব হবে না থানায় থানায় সৈন্য পাঠানো। বরং তারা নবতর শক্তি সঞ্চয় ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহকুমা ও জেলা শহরগুলোতে অর্থাৎ আঞ্চলিক প্রধান ঘাঁটিতে সম্মিলিত হবে। তখন সময় না দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে গ্রাম থেকে জনগণের উত্তাল ঢেউকে নিয়ে শত্রুঘাঁটির চারপাশে ঘেরাও দিয়ে রাখতে হবে —অবরোধ গড়ে তুলতে হবে সুদৃঢ়তার সঙ্গে। শত্রুদের যোগাযোগ লাইন বিচ্ছিন্ন করতে হবে—ভেঙে দিতে হবে তাদের চলাচলের রাস্তাসমূহ—পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে।

রসদ বন্ধ।
খাদ্য নেই।
পানি নেই।
যোগাযোগ নেই।
আলো নেই।

সাপ্লাই নেই—বাঁচার আশাও নেই—অন্ধকার ভয়ঙ্করতার ভেতর ধীরে ধীরে ডুবে যাবে।—শেষ হয়ে যাবে।—Encirclement এই কৌশলকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু বললেন :

—আমরা ভাতে মারবো!
আমরা পানিতে মারবো!

সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না……

—স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা : গণযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ও হানাদার বাহিনীর পরাজয় প্রসঙ্গে···

সূর্যের সুজন-আলোকে আচ্ছন্ন থেকে নিভৃত রাতের অন্ধকার রাতের ভয়াবহতায় রক্ত আর বারুদের গন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্ষুধা,

ক্লান্তি আর অবসন্নতায় শ্রান্ত হয়ে ঝাড়-ঝোপের বিরক্তিকর পতঙ্গ ও সরীসৃপের সচল যন্ত্রণার মাঝে তুমি বলে উঠলে, আর কত দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ এভাবে চলবে? এই অবসাদগ্রস্ত এবং ক্লান্তিতে জড়ানো চেহারার আত্মাটি যখন বাংলাদেশের এই অসম যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মানচিত্রে মোটা চোখে তাকায় তখন আবার সে আশার নবতর পাখি হয়ে দাঁড়ায়—পরাধীনতার পরিধিকে ছিন্ন করার প্রচণ্ড মানসিকতায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে—বুকভরা অসীম আশা আর মুক্তির আনন্দে বুড়ো পুরানো রাইফেলটিকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে চলতি পথের দুরূহতাকে অনায়াসে অতিক্রম করে। এই মানসিক বিশিষ্টতার ভেতর বাংলাদেশের জনযুদ্ধের ক্রমশ তীব্রতা এবং নিশ্চিত বিজয়লাভের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকে—

আত্মবিস্ফোরণ! বাংলার নয়নমনি—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উদ্বোধক, সংগঠক এবং জনক। খাঁটি ও নির্ভেজাল স্বদেশপ্রীতির অনির্বাণ সূর্যটি কারাগারের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মানবপ্রীতির ঐশ্বর্য আহরণ করেছেন, যন্ত্রণার অগ্নিগর্ভ থেকে শপথ নিয়েছেন আপসহীন সংগ্রামের। সর্বহারা বিপ্লবের নায়ক লেলিন আজ দূরপ্রবাসী!—নক্ষত্রে স্নিগ্ধতা আছে, তাঁর স্পর্শে জ্বালা নেই। হো চি-মিন আপন লোক, ঘরের লোক—আঙিনায় বসে পাখপাখালি-মুখরিত সন্ধ্যায় বাপ-চাচার সঙ্গে বয়েসী ব্যক্তির বৈষয়িক পরামর্শদাতা; আপন করে কাছে টানে, মমতার স্নিগ্ধতায় বুকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপে উষ্ণতা আনে না। আবেগের মেঘ সঞ্চারিত হয় না। চীনের মাও প্রবাদবাক্য, যেন অধুনা রূপকথার বহুকথিত নায়ক, যাঁর চোখের দীপ্তিতে লক্ষ লোকের উদ্বেলতা—যাঁর মুখের বাণীতে দূর সমুদ্রের কল্লোল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়, যাঁর উদ্যম-উদাহরণে ভয়ঙ্কর নদীতে হাজারো সাঁতারুর দুর্দম সন্তরণ, আর শেখ মুজিব—যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়

সাড়ে সাত কোটি আত্মার আকাঙ্ক্ষা—তাদের ক্রন্দন এবং হাহাকার —তাদের আনন্দ আর উল্লাসের সঙ্গীতধারা! তাঁর হাসিতে বাংলার আকাশ উজ্জ্বল হয়, তাঁর কঠোরতায় আষাঢ়ের মেঘের বিদ্যুৎ চমকায়, তাঁর নির্দেশে সূর্যের প্লাবন নেমে আসে, তাঁর ইঙ্গিতে জনতার সমুদ্র চঞ্চল কিংবা স্থির হয়, অথবা উল্লাসে ফেটে পড়ে। সাড়ে সাত কোটি জনতা যেন কথা কয় এক কণ্ঠে, —এক ভাষায় এবং এক ভঙ্গীতে। বাংলার আবেগ তাঁকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণিত ও চূর্ণিত। তাঁর হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শে সংগ্রামী আত্মা তীক্ষ্ণ হয়। এই ব্যক্তিক আবেদনের প্রেক্ষিতে সমগ্র জাতি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক অফিসার, ধর্মকেন্দ্রিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রগতিশীল দল সবাই এই বিরাট ব্যক্তির আহ্বানে ঐক্যের মিনারে এসে দাঁড়ায়ঃ এক হয়ে সমর্থনের উষ্ণতায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। তা ছাড়া, জনগণ বৈপ্লবিক চেতনায় দীক্ষিত হয়ে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষায় জাতীয় মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো অহিংসা আন্দোলনের পটভূমিকায়। আন্দোলন অহিংস হলেও এর কার্যকারিতার পরিণামগত ফলের জন্য গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় সশস্ত্র জোয়ানের প্রাথমিক প্রস্তুতি দিবারাত চলছিলো। জনগণ অহিংস আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তাদের মানসিকতায় স্বাধীনতার নবতর ইচ্ছার বলিষ্ঠতা ও একাগ্রতা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন রাতারাতি সশস্ত্র সরব সংঘর্ষে পরিণত হতো না, যদি-না দেশের জনগণের মানসিকতা এর জন্য সামগ্রিক অর্থে প্রস্তুত না থাকতো। এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, অহিংস আন্দোলন থেকে রাতারাতি সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে উত্তরণ।

অবশ্য এটি একদিনে হয় নি। এর পেছনে রয়েছে তেইশ বছরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিকা!

এ-প্রসঙ্গে এডোয়ার্ড এস. মাগন বলেনঃ What started as a movement for economic autonomy within the framework of

a united Pakistan has been irrevocably transformed by the wholesale laughter of East Pakistan civilian into a movement that, sooner or later, will produce an independent East Pakistan—'Bangladesh' is a matter of time. •

বিগত তেইশ বছরের অথনৈতিক শোষণের যাঁতাকল থেকে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধু ছয়-দফা নীতি প্রণয়ন করলেন। ছয়-দফার ভেতর বাঙালীর রাজনৈতিক ও অথনৈতিক রূপরেখা স্পৃষ্ট চেহারায় তুলে ধরলেন। যুগে যুগে বাংলাদেশকে শোষণ করবার জন্য বহু হানাদার বর্গীবাহিনী বাংলার মাটিকে রক্তরাঙা করেছে—কিন্তু কেউই টিকতে পারে নি-বাংলার মাটি একে একে সবাইকে করেছে গ্রাস। তবু শোষণের কালো হাত বার-বার বাংলার মাটির মাকে গলা টিপে ধরার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

জনসংখায় আমরা ছাপান্নো, ওরা চুয়াল্লিশ ।

রাজধানী কোথায় হলো ?

করাচীতে—ইসলামাবাদে—সংখ্যালঘিষ্ঠদের দেশে ।

কলকারখানা কোথায় গড়ে উঠেলো !

পশ্চিম পাকিস্তানে ।

কার টাকায়—পুঁজি কোথায়—বৈদেশিক মুদ্রা ?

বাংলাদেশের টাকায়—চা, চামড়া, তামাকের টাকায় ।

বাংলার অভিশাপ বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই—আছে লবণাক্ততা দূর করার জন্য বিশেষ তহবিল ।

ড্যাম কোথায় উদ্বোধিত হলো ?

নতুন ইনডাষ্ট্রির ধোঁয়া উঠলো কোথায় ?

• লেখক আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রফেসর ইমেরিটাস, ; দীর্ঘকাল তিনি আমেরিক সরকার ও বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা এবং ইদানং সরকারের প্যাটারজন কমিশনের (বৈদেশিক সাহায্য) সদস্য। পাকিস্তানের প্রথম বার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন।

অর্ডিন্যাস, ফ্যাক্টরী কোথায় সম্পূর্ণ হলো ?
সামরিক দপ্তরগুলো কোথায় স্থাপিত হলো ?
—এক কথায় পশ্চিম পাকিস্তানে।

২১-এ ফেব্রুয়ারির সংঘাতে

বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা-উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগলো—কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন এই অবিচার, নিদারুণ বৈষম্য আর অর্থনৈতিক শোষণ ?
কেন সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ষড়যন্ত্র।
ষড়যন্ত্র—
ষড়যন্ত্র চাকরির ক্ষেত্রে,
শিক্ষার ক্ষেত্রে,
দেশরক্ষা—বৈদেশিক ক্ষেত্রে,
বাজেটে,
আর উন্নয়নে।

ব্যাংক হলো : বোর্ড হলো—বাঙালীর স্থান নেই।
বীমা কোম্পানি খুললো—বাঙালীর কর্ম নেই।
যান দেশরক্ষা আর কেন্দ্রীয় চাকরিতে—বাঙালী যোগ্য নয়।
বৈদেশিক বিভাগ আর শিক্ষায়—বাঙালী অচল।
বাজেট হলো : বন্যা-নিয়ন্ত্রণের টাকা নেই।
উন্নয়ন কর্ম : পরিকল্পনা চলছে।
ব্যবসা-বাণিজ্য করবে : লাইসেন্স পাবে না।
বাঙালী দেখলো—শোষণের চিত্র।

চিত্র—এক

সোনাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
মোটা চাল—	৪০-৫০ টাকা	১৮-২৮ টাকা প্রতি মণ

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
গম—	২০-২৫ টাকা	১০-১৫ টাকা প্রতিমণ
সরিষার তেল—	৫ টাকা	২.৫০ টাকা প্রতি সের
সোনা—	১৬০-১৬৫ টাকা	৯৪৫-১৫০ টাকা প্রতি তোলা।

চিত্র—দুই

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে (শতকরা হিসাবে)

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
সেক্রেটারী—	১৪	৮৬
জয়েন্ট সেক্রেটারী	৬	৯৪
ডেপুটি ”	৯৮	৮২
অন্যান্য অফিসার—	২০	৮০

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

চিত্র—তিন

বৈদেশিক চাকরির ক্ষেত্রে

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাষ্ট্রদূত সহ		
প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী—	৫৮	১৭৯
দ্বিতীয় ,, ,, —	৪৮	১৯৬
তৃতীয় ,, ,, —	১৭	৫৮
চতুর্থ ,, ,, —	৮	৮৯

চিত্র—চার

শিক্ষার ক্ষেত্রে

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাশ্চিকস্তান
পলিটেকনিক—	১৭	৩৪
টিচার ট্রেনিং স্কুল—	৫৯	৮৭
বিশ্ববিদ্যালয়—	৪	৬
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—	১	৭
মেডিক্যাল ” —	৭	৯
আইন ” —	৫	৮
বাণিজ্য ” —	২	৫
কৃষি ” —	৯	৪

টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-বছর অর্থমঞ্জুরী হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা, সে বছরই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

চিত্র—পাঁচ

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
হাসপাতাল—	৭৬	৩৯৩
ডিসপেনসারি—	৪৮৯	১,৭৫৪
হাসপাতালের বেড—	৬,৯৮৪	২৬,২০০

চিত্র—ছয়

উন্নয়ন খাতে ব্যয়

সাল	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫--	২৭১ কোটি টাকা ২০%	১,১২৯ কোটি টাকা ৮০%
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯/৬০—	৫২৪ ” ২৬%	১,৬৫৫ ” ” ৭৪%
১৯৬০/৬১-১৬৬৪/৬৫	১,৪০৪ ” ৩২%	৩,৩৫৫ ” ” ৬৮%
১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০-	২,১৪১ ” ৩৬%	৫,১৯৫ ” ” ৬৪%

চিত্র—সাত

একনজরে কেন্দ্রীয় চাকরিতে বৈষম্য

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রতিরক্ষা দপ্তর—	৮.১%	৯১.৯%
স্বরাষ্ট্র ” —	২২.৫%	৭৭.৫%
শিক্ষা ” —	২৭.৩%	৭২.৭%
তথ্য ” —	২০.১%	৭৯.৯%
স্বাস্থ্য ” —	১৯%	৮১%
কৃষি ” —	২১%	৭৯%
আইন ” —	৩৫%	৬৫%

এ এক নিদারুণ চিত্র।

চিত্র দেখলো আর ভাবলো।

ভাবলো আর প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত হলো।

শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের ক্ষমতাহীন আক্রোশ। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা ভূস্বামী-শাসকচক্রের বিরুদ্ধে শোষিত বাংলার আক্রোশকে বঙ্গবন্ধু সরব আকর্ষণে ঐক্যবদ্ধ করলেন -আক্রোশ মোচনের প্রয়াস নিলেন, বিক্ষোভের পুঞ্জীভূত ধোঁয়াকে দূরীভূত করার ক্লান্তিহীন সাধনা নিলেন।

হলো না।

শোষকের লোভী জিহ্বা নিবৃত্ত হলো না—

বরং চিরতরে দাবির ন্যায্যতাকে ধ্বংস করার জন্য বন্য উল্লাসে মেতে উঠলো।

অর্থনৈতিক মুক্তি-আন্দোলন রাজনৈতিক স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে উত্তরিত হলো।

এ উত্তরণের পেছনে সীমাহীন আর অশেষ রক্তের বন্যা।

অসীম ক্ষুধা আর বেকারত্বের নিদারুণ যন্ত্রণা!

লুণ্ঠনের করুণ চিত্র আর প্রতারণার নিঃশব্দ ষড়যন্ত্র!

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

ষড়যন্ত্র চললো সংস্কৃতির আঙ্গিনায়—

ওরা বললো : না।

সমুদ্র গর্জন করলো : না।

বাতাস ঝড় হলো, বললো : না।

না।

না।

না।

উর্দু নয়—বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করো।

জেল এলো : বীরদর্পে ওরা ঢুকে গেলো।

বুলেট এলো : ওরা বুক পেতে নিলো।

তবু বাংলাভাষা মায়ের ভাষা চাই।

ষড়যন্ত্র চলেছিলো—বাংলা হিন্দুর ভাষা—ওটা তুলে দাও, পাকিস্তানের বুক থেকে ওকে নির্বাসিত করো।

পারলো না ওরা।

বাঙ্গালীর জয় হলো।

বুলেট আর বেয়নেটের আঘাতে বাঙালীর চেতনা জাগ্রত হলো।

দেখলো কী ষড়যন্ত্র।

জঘন্য নিলর্জ্জতার দাম্ভিকতা।

আয়ুব বললো ঃ মুসলমানী সাহিত্য চাই।

দালালদের পাড়ায় উল্লাস।

বি.এন. আর-এর গোলামির বীণা বেজে উঠলো।

মোনেম বললো ঃ স্বরচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত চাই—

বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ হলো।

বাঙালীর ইতিহাস বিকৃত করে লেখা হলো ঃ প্রভু নয়, বন্ধু।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা স্তব্ধ হলো।

রাজনৈতিক চোরাবালির পথে বাঙালীর উৎসবের জীবন নিস্পন্দন হয়ে এলো।

কতদিন?

জনতা জাগলো—বেদনার ইতিহাস তাদের স্পর্শ করলো—তারা ঐক্যবদ্ধ হলো—এক হয়ে মিশে গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আর রিকশাওয়ালার রক্ত!—এক উদ্দেশ্যে এক লক্ষ্যে।

রক্তের নদীর উত্তাল তরঙ্গে আয়ুব ভেসে গেলো।

মুজিব জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বললেন ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত বেতারে চলবে। চললো।

বললেন ঃ বাঙালীর সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে, বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানালেন বাঙালীর ইতিহাস নতুন করে লিখবার জন্য—সে ইতিহাস, সূর্য সেনের প্রীতিলতার, বাঘা যতীনের আর হাজারো সসূর্য প্রাণের!

বাঙালীর সাংস্কৃতিক উত্তাল জোয়ার এলো। প্রাণ খুলে বাঙালী গান গাইলো, হাসলো—উৎসবে মাতলো—জীবনের জাগরণের

সম্ভাবনাময় বিপ্লবের দীপ্ত বাণীর কণ্ঠ ভেসে এলো—জয় বাংলার জয়গানে,—সোনার বাংলার স্তুতিবন্দনায়।

শোষকচক্রের সহ্য হয় নি তা। কণ্ঠরোধের জন্য গলা টিপে ধরা নয় এবার—চিরতরে নির্বাক গোলামীর শৃঙ্খল পরাবার বিভীষিকাময় অত্যাচারী অপপ্রয়াস।

সে প্রয়াস ব্যর্থ হবে।

পূর্বদিগন্তে লাল আভা সূর্যের আলোর বাতাসে বেতারের কণ্ঠে ভেসে আসে তখনো ঃ জয় বাংলা !

এমনি করে আন্দোলন আর রক্ত।

রক্ত আর সংঘাত।

সংঘাত আর সংঘর্ষ।

সংঘর্ষ আর প্রতিরোধ বাঙালী মানসিকতাকে তেইশ বছর ধরে লালিত করেছে, বর্ধিত এবং বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত করেছে।

তাই অহিংস আন্দোলন রাতারাতি সশস্ত্র প্রতিরোধে দুর্বার হয়ে উঠার কারণ রূপে তেইশ বছরের হাজারো আর্তনাদের ইতিহাস, হাজারো প্রাণের রক্তের উষ্ণ আবেগ, শোষণের আর বঞ্চনার বাস্তব চিত্রের কারুণ্য,—বিস্তীর্ণ পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে !

যার ফলে—

ছাত্র এলো উত্তোলিত হস্তে,
শিক্ষক এলো প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে,
মাঝি এলো বৈঠা হাতে,
কৃষক এলো লাঙ্গল কাঁধে,
শ্রমিক এলো গাঁইতি নিয়ে,
আমলারা এলো পুরানো রীতির জুতো ছেড়ে,
পুলিশ এলো তার দুর্নীতিবাদ রেখে,
আনসার এলো—এলো ই. পি. আর,
এলো বেঙ্গল রেজিমেণ্ট অস্ত্রহাতে—

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

নেতার কাছে।

নেতার নির্দেশিত পথে। এক মুখ-বাণীর

স্বাধীনতার পথে।

নেতার কাছে এলো।

কিন্তু নেতা নেই ; নীতি আছে—আছে বজ্রকণ্ঠের অভয় বাণী ঃ

স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র। পথ চলো।

ভুল হবে। ভুল হলো।

অভাব হলো যোগাযোগের,

কো-অর্ডিনেশনের,

অভাব নেতৃত্বের আর শৃঙ্খলার,

অভাব নির্দেশের আর কমাণ্ডের।

তবু চলো। চলো স্বাধীনতার পথে। যার যার শহরে হানাদার সৈন্য খতম করো। গ্রাম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এলো।

কেউ খাদ্য নিয়ে, কেউ লাঠি নিয়ে, কেউ বা দেশী বন্দুক নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছো? চলো। শহর ঘেরাও করো। শত্রু মারো। স্বাধীন করো দেশ। ঘিরে রেখো। নেতার নির্দেশ ছিলো ঃ ভাতে মারো, পানিতে মারো।

চুপচাপ আছো কেন? শ্লোগান দাও ঃ জয় বাংলা। শত্রুরা কাঁপছে। হট্‌ছে। পড়ছে। লুকোচ্ছে। বকুলরা এগিয়ে গেলো ঃ পাবনা মুক্ত হলো। মাসুদরা প্রাণ দিলো ঃ বগুড়া মুক্ত হলো। টুকুরা য়্যামবুশে বসলো ঃ হানাদার খতম হলো। খতম হলো সর্বত্র। মুক্ত হলো অনেক জেলা।

আকাশ থেকে আগুন-বৃষ্টি।

নতুন সৈন্য এলো। গোলা এলো। ট্যাঙ্ক চললো।

আর এদের গুলি ফুরিয়ে গেলো। মুক্তাঞ্চলে পিছিয়ে এলো। একত্রিত হলো। ট্রেনিং নিলো লক্ষ মুজিববাহিনী। এগিয়ে যাচ্ছে। শত্রু মারছে আর শুনছে—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!

জনযুদ্ধের এই বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো : বাংলাদেশের ইতিহাসে জনগণই বরাবর সঙ্কটের সময় পথ নির্দেশ করেছে। নেতা আর জনগণ যেন অভিন্ন। একটি আত্মার দুইটি প্রতিধ্বনি : যার সুর এক, সঙ্গীত এক, লক্ষ্য এক। তবু জনতাই যেন বারবার এগিয়ে গেছে আর নেতা সেই এগিয়ে যাওয়ার পথের সম্ভাবনার কথা, বিপদের কথা, সঙ্কটের কথা, সঙ্কট উত্তরণের মন্ত্র, বাণী ; সমাধানের কথা ; বলিষ্ঠ ও ভরাট কণ্ঠস্বরে নিয়তির মতো ঘোষণা করেছেন : যাতে জনগণ উদ্বেলিত হয়েছে, আন্দোলিত হয়েছে, সংহত হয়েছে, সতর্ক হয়েছে আর এগিয়ে যাবার দুর্বার শক্তি সংগ্রহ করেছে। আর সেই ঐক্যবদ্ধ সংগৃহীত শক্তি নিয়ে জনগণ দুর্বার গতিতে প্রতিরোধ-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আওয়ামী লীগ-নেতৃত্বে পঁচিশে মার্চের পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণায় দ্বিধা ছিলো চরম, ভবিষ্যৎ-পরিণতি ভাবনায় নিয়মতান্ত্রিক পার্টি হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক : কিন্তু জনগণের মনে দ্বন্দ্ব ছিলো না, দ্বিধা ছিলো না, নিঃশঙ্ক নির্ভীক চিত্তে তারা পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিলো,—

অস্ত্র নেই—কিন্তু মানসিকতা ছিলো।

রাইফেল নেই—কিন্তু ছিলো নেতার নির্দেশ।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই—কিন্তু ছিলো আদর্শ আর জাতীয়তাবোধ, ছিলো দেশপ্রেম। আর শোষণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ!

তাই নেতার ইঙ্গিতে জনগণ পরিচালিত হয়েছে। আদেশের অপেক্ষা করেনি।

তাই নেতার ইশারায় জনগণ এগিয়ে গেছে : ঘোষণার অপেক্ষা করে নি। বাংলাদেশের গণযুদ্ধের এ এক অভিনব বৈশিষ্ট্য!

এ গণযুদ্ধের এক বিশেষ দিক হলো : পাকবাহিনীর ভেতর সামরিক কর্মরত সেনাবাহিনীও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে।

চে বলেছিলেন ঃ পেশাদারী সেনাবাহিনী কোন দিনই বিপ্লবী সংগ্রামে সাড়া দিতে পারে না। চে-এর বিশ্বাসকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলাদেশের বীর সন্তানরা—(পুর্ব-পাকিস্তান রাইফেল, পুর্ববাংলা রেজিমেণ্ট, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী) পশ্চিমী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে নেমেই তারা দেখলো —শত্রু অস্ত্রবলে, সংখ্যায় এবং সুসম পরিকল্পনায় অধিকতর শক্তিশালী। শত্রুকে ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি গ্রুপ-বিমান ও নৌবাহিনী প্রত্যক্ষ সম্মুখ-সমরে সুবিধা করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব। তবু বাংলার বীর সন্তানরা ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-পাবনা-সৈয়দপুর-যশোহর-কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর-নোয়াখালী, বগুড়া, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এবং সর্বত্রই সম্মুখযুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে লড়াই করেছে। কোথাও সফল হয়েছে ; কোথাও ব্যর্থ হয়েছে। অল্পসংখ্যক লোকের বাহিনীগুলোর মূলধনই ছিলো জনগণের অকৃত্রিম সহযোগিতা। বাংলার গৃহযুদ্ধের এই বৈশিষ্ট্যগুলো---গণযুদ্ধের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন !

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

…একটি পয়সাও আর পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে দেবো না…

এই সশস্ত্র যুদ্ধের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশের সম্পদ নিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রেরা বিদেশ থেকে আনে গুলী, কেনে ট্যাঙ্ক, বিমান ও যুদ্ধের সরঞ্জাম। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে যাতে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে সেজন্যও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে হবে—বাংলাদেশের পাটের টাকা, চা-চামড়ার টাকা, তামাকের টাকায় অর্জিত হয় পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবরোধ গড়ে তুলে বাংলাদেশ থেকে যাতে এক পয়সাও না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে এবং সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রব্যসম্ভার যাতে হানাদার বাহিনীর হাতে না পড়ে—মুক্তাঞ্চল বাংলাদেশ সরকারের হাতে আসে তার জন্য বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এতে দেউলিয়া ও মৃত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে—যা যুদ্ধের অন্যতম শর্ত ও অবলম্বন হয়ে দাঁড়াবে।

এ অর্থনৈতিক অবরোধ সম্ভবপর হতো না—যদি বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অখণ্ড অঞ্চল (Integrated land) হতো। পনের শ' মাইল ব্যবধানের ফলে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অচলাবস্থার জন্য এবং জনগণের সমর্থনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ও সামরিক সংগঠনের যৌথ পরিকল্পনায় ও প্রচেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সম্ভব।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপনির্বাচনের প্রহসনকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। তাবেদারী দালালগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং সামরিক অপারেশনে তাদের খতম করতে

হবে। এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে দালালী করার সাহস কারো না হয়।

হানাদার বাহিনীর পরাজয় প্রসঙ্গে :

পাকিস্তান উত্তরাধিকার-সূত্রে এক সুসংগঠিত বাহিনী লাভ করেছিলো—ভারত-বিরোধিতাকে সামনে রেখে নবতর জাতির উদগ্র স্পৃহাকে সামরিক সংগঠনে রূপ দেবার সুযোগলাভ করছিলো। তা ছাড়া বিগত তেইশ বছর ধরে পাকিস্তানের জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ সেনাবাহিনীর পেছনেই ব্যয় হয়েছে; ফলে গড়ে উঠেছিলো এক বিশাল সামরিক বাহিনী। যারা আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ, সাহসে ও দক্ষতায় প্রথম সারির। বৃহৎ শক্তিবর্গের এ উপমহাদেশে ব্যালান্স অব পাওয়ার-এর নির্ভুল খেলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান পেয়েছে সামরিক প্রাচুর্য, উন্নত ও সর্বাধুনিক সমরসম্ভার।

সেই 'মেকানাইজড্' আর্মির সঙ্গে আমাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ চলছে—প্রতিরোধের যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ।

এই অসম-যুদ্ধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় বিচার্য : পশ্চিম পাকিস্তানের দিক থেকে :

বিগত তেইশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে তুলনামূলকভাবে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কল হয়েছে—কারখানা হয়েছে।

ড্যাম হয়েছে—বাঁধ হয়েছে।

সেচ-পরিকল্পনায় ঊষর মরুভূমি সবুজ হয়েছে।

জলের লবণাক্ততা দূর হয়েছে।

ফসল ফলেছে। সম্পদ বেড়েছে।

তবু

ক্ষুধা—

দারিদ্র্য—

সাধারণ মানুষ সে উন্নতির আস্বাদন পায় নি তেমন।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

বাইশ পরিবার
আর তার
আমলা।
মুৎসুদ্দি—
দালাল গোষ্ঠী
এরা করেছে তার ফলভোগ।
ফলে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে
বিক্ষোভের বারুদ অগ্নিগর্ভ হয়েছে
বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়ায়
আন্দোলন
আলোড়ন
মিছিল শ্লোগান
সামন্ত প্রভুর হাত থেকে মুক্তি চাই!
আয়ুব খান বিতাড়িত হলো।
মঞ্চে এলো ভুট্টো।
মুখে সর্বহারার কথা
অন্তরালে পুঁজিপতির সখ্য-চরিত্র
মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি—
নেপথ্যে সামন্ত প্রভু তিনি স্বয়ং
মুখে ইসলামের বুলি
আড়ালে ফেনায়িত মদের উন্মত্ততা!
ষড়যন্ত্র
ষড়যন্ত্র
আর ষড়যন্ত্র
একদিকে কায়েমী পশুশক্তির আজ্ঞাবাহী : কাইয়ুম
অন্যদিকে ভগ্নস্বাস্থ্যের চাণক্য কূট : দৌলতানা
একদিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ভিলেন : নসরুল্লাহ্

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীর প্রত্যক্ষ প্রবক্তা : মওতুদী
সবার পথযাত্রা ভিন্ন, ঢং-এ ও রং-এ
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন : বাংলা শোষণ।
বাংলার টাকা না গেলে লেফ্‌ট-রাইট বন্ধ।
বিপুল সামরিক ব্যয়ভার : অর্থ চাই—সম্পদ চাই।

বাংলাদেশ থেকে টাকা না আসলে সর্বনাশ—হাতছাড়া করলে চলবে না : এক কোটি মারা যাক, তাতে কী—রক্তের নদী হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। অতএব গণহত্যা। বুটের দাপটে অধিকারের দাবির কণ্ঠরোধ! বেয়নেটের আঘাতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি রক্তাক্ত!

পশ্চিম পাকিস্তানে মেঘ জমতে শুরু করেছে।
ভুট্টো বুঝেছে—ক্ষমতা সে পাবে না।
সামরিক জান্তা ক্ষমতার আস্বাদ ছাড়বে না।
ভুট্টো হুমকি ছাড়ছে।
ওয়ালীর পাখতুন্‌রা অস্ত্র শানাচ্ছে।
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা অধিকাবের দাবি তুলছে।
বাংলার বাজার অচল।
পণ্য চলে না—চলবে না। চলছে না।
সংবাদ হলো : গুদামে মাল আঁটে না।
বাংলায় মাল আসে না।
চাকা বন্ধ হচ্ছে এবং হবে।
পুঁজিপতিরা বিরক্ত হচ্ছে
শ্রমিক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে।
জাগছে
জাগবে
সাধারণ মানুষ

খেটে খাওয়া মানুষ।
চিন্তাশীল আর বুদ্ধিজীবীরা।
অর্থনীতি ভেঙে গেছে।
বাংলার বাজার বন্ধ।
বাংলার টাকা-সম্পদ পাচার বন্ধ।
কতদিন চলবে—যুদ্ধ!
চীন ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ক'দিন সাহায্য করবে? কিসের আশায় এবং কত?
মাথার উপর ঋণের খড়গ!
বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা বন্ধ!
বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষ—
জঙ্গী সরকার কতদিন যুদ্ধ চালাবে।
বাংলাদেশের দিক থেকে ঃ
শত্রু বিদেশী এবং হানাদার।
বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ নেই
সম্পর্ক নেই—
সৌহার্দ্য নেই—
বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে তার মিল নেই।
মিল নেই চরিত্রের—
চেহারার
আচরণের
ভাষার
আর
সংস্কৃতির।
শত্রু সম্পূর্ণ বিদেশী এবং হানাদার। তাদের সনাক্ত করা সহজ। বিভ্রান্ত করা সুবিধাজনক।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

পনের শ' মাইল দূরে তার দেশ। মাঝখানে বৈরী-ভারত আর অশান্ত বঙ্গোপোসাগর। যাতায়াতের পথ সুগম নয়ঃ দুর্গম ও দুরূহ। পথ-পরিক্রমা দীর্ঘ এবং সময়-সাপেক্ষ। সাপ্লাই লাইন অনিশ্চিত। তা ছাড়া তাদের ভেতর দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বেলুচ-পাঞ্জাবীর। পাঞ্জাবীর-পাঠানের। অন্যদিকে বিবাদ—পানি নিয়ে—ক্ষমতা নিয়ে।

বাংলাদেশের প্রত্যেক ঘর গেরিলাদের দুর্গ। কৃষক-মাঝি তাঁতি-জেলের সঙ্গে মিশে থেকে গেরিলারা কাজ করতে পারে আপন হয়ে—জনগণের একজন হয়ে। তাই এ বাংলাদেশের সীমান্ত রাষ্ট্র ভারত, বন্ধু দেশ। সীমানাটা তাই গেরিলাদের জন্য 'যুদ্ধের দেয়াল'। সাতাশ শ' মাইল সীমানা বন্ধ করা পাক সেনার পক্ষে সম্ভব নয়—সম্ভব নয় গেরিলাদের ঠেকানো—তাই অসম্ভব প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালুকরণ। ভিয়েতনামের মত পয়ষট্টি হাজার গ্রামকে 'স্ট্র্যাটেজিক ভিলেজ' করা সম্ভব নয়—অত সৈন্য পাক-জঙ্গীর নেই। আর বাঙালী অধিকার সচেতন। পারবে না তাই কেউ আত্মসচেতন্ জাতিকে ঠেকিয়ে রাখতে।

দিন দিন 'মুক্তিফৌজের' সংখ্যা বৃদ্ধি হবে।
গেরিলা বাহিনী থেকে গঠিত হবে—
মোবাইল ওয়ারফেয়ার—
তারপর পজিশনাল ওয়ারফেয়ার—
চূড়ান্ত আঘাত হানা।

এই আঘাত হানার সম্পূর্ণ দিনটির জন্য বিপ্লবের ইতিহাসে পূরণীয় তিনটি শর্ত দিলেন মাও—

বললেন : দেশের অভ্যন্তরে
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

স্বাধীনতার জন্য কমন ফ্রন্ট গঠন করো—যারা স্বাধীনতা চায় তাদের নিয়ে একসাথে ঐক্যফ্রন্ট, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধুভাবাপন্ন

দেশের সঙ্গে মৈত্রী সুদৃঢ় করো—শত্রু-বিরোধী ফ্রণ্ট তৈরি করো সেখানেও। আর শত্রু-দেশের জনগণের ভেতর অসন্তোষ, বিক্ষোভ আর বিদ্রোহকে প্রত্যাসন্ন করে তোলো।

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী দলসমূহকে নিয়ে গঠন করেছেন 'পরামর্শ কমিটি'। গঠন করেছেন আন্তর্জাতিক জনমত। বাংলাদেশের সপক্ষে বিশ্ব-জনমত আজ সোচ্চার। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর, জঙ্গী শাসকদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রাভদা থেকে শুরু করে লণ্ডনের, আমেরিকার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা আজ বাংলাদেশের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছে এবং করছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বহু বিতর্কিত সমস্যা—রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো (চীন বাদে) সৌজন্যের হাত সম্প্রসারণ করেছে ইতিমধ্যেই। দিন গেলে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ভূমিকা আরো স্পষ্ট হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। কেননা সেখানকার সচেতন বিবেকবান রাজনীতিবিদ্‌দের ইতিমধ্যেই কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পাঠানো হয়েছে জয়সিন্ধের প্রবক্তা জি· এম সৈয়দকে, সমাজতন্ত্রের দিশারী মাহমুদুল হক ওসমানীকে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে এবং আরো অনেককে। এটা ঝড়ের লক্ষণ!

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা দিন দিন দুর্বার হয়ে উঠবে আর হানাদারবাহিনীর মনোবল প্রতি মূহূর্তে হবে নিঃশেষিত। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব করবে তাদের বিভক্ত—তার ছায়া পড়বে হানাদার সেনাবাহিনীর উপর। অর্থনৈতিক ভিত্তি যাবে ধ্বসে—মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। সাধারণ লোকের মনে দানা বাঁধবে অসন্তোষ। সেই অসন্তোষ একদিন ফেটে পড়বে—শেষ হবে তারা নিজেদের হানাহানিতেই

—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আসবে সপক্ষে—বিশ্বজনমত ও বিবেক কথা বলবে নির্ভীক কণ্ঠে—তার সাথে থাকবে মুক্তিবাহিনীর নির্ভুল কলাকৌশল ও প্রয়োগনিপুণতা, শত্রুর মাথার উপর তখন মৃত্যুর ঘণ্টা বাজবে।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আলোয় বাংলার রক্তাক্ত প্রান্তর হবে সম্ভাবনার নতুন আশায় মুখরিত !

……ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো ……

বিদেশী জেনারেল কথা বলেছিলেন। যুদ্ধরীতির প্রসঙ্গে আসতেই তিনি বিনম্র চিত্তে বললেন : আপনাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গেরিলা যুদ্ধের কথাই স্পষ্ট করে বলে গেছেন—উপরের উদ্ধৃতিকে সামনে রাখলেন তিনি। বস্তুত গেরিলা যুদ্ধ প্রত্যেক ঘরকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্ভেদ্য করে গড়ে তুলবার সীমাহীন সাধনা। সরল সাধারণ নিরলস জীবন—প্রাত্যহিকীর বিড়ম্বনায় প্রয়োজন সেখানেও ভীড় জমায়—তবু এরই নেপথ্যে গহন অন্তঃসলিলার মত সে এক ধারা : ফেনিল সশব্দতায় ভেঙ্গে পড়া নয়, হাওয়ার প্রবল টানে আর উচ্ছ্বাসের দাম্ভিকতায় সরব ঘোষণা নেই—নীরব, নিঃশব্দ বিচিত্র সম্ভারের এক-লক্ষ্যপুর্ণ এক-মুখীনতা ; আদর্শ আর উদ্দেশ্যের ঐক্যে প্রত্যেক ঘরকে দুর্গে পরিণত করার সার্থকতায় গেরিলা যুদ্ধ যুদ্ধরীতির ইতিহাসে এক অনন্য প্রক্রিয়া : সংগ্রামের ধারাপাতে অন্য নাম, অন্য নাম্‌তা।

কোলাহল নেই, আড়ম্বর নেই, জমকালো সম্ভার নেই, নেই আয়োজনের অসীম ব্যস্ততা—শুধুই আকস্মিকতার আক্রমণে শত্রুহনন : ত্রাসসৃষ্টি, তারপর চট্‌পট সরে পড়া, অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর বৃথাই বিনিদ্র রজনীর প্রতীক্ষা! গেরিলাদের ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তাদের কাছে পাওয়া যায় না—তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না—হাওয়ার সাথে মিশে থাকে তারা, জনতার অরণ্যে ওৎপাতা বাঘের মত লুকিয়ে থাকে তারা—বুঝবার উপায় নেই, ধরবার সাধ্য নেই, সন্দেহের অবকাশ নেই—অসতর্ক মুহূর্তে শিকারের উপর সহসা ঝাঁপিয়ে পড়া মরণ ছোবল—এ এক যুদ্ধরীতির বিস্ময় যা বহু অতীতের অনুশীলনে গড়ে উঠেছে—বহু দেশপ্রেমিকের হৃদয়ের

রক্তে পথ করে নিয়েছে, সে গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস আর কাহিনী, রূপান্তর আর পটভূমিকা শতাব্দীর সীমানায় প্রসারিত !

* * * *

গুয়েরিলা—

ছোট্ট স্প্যানিশ শব্দ !

বর্তমানে বিপ্লবের ইতিহাসে তারই চালু নাম ঃ গেরিলা ঃ ছোট যুদ্ধ—খণ্ডযুদ্ধ।

ছোট দলের ছোট যুদ্ধ !

ছোট যুদ্ধ হলেও ফল তার প্রচণ্ড ঃ পরিণতি ভয়ঙ্কর !

ছোট দল ! কত ছোট ?

চে সংখ্যায় বললেন না। সাধারণভাবে বললেন ঃ **To function in small groups makes the squad the true unit.**

ফিদেল বললেন ঃ দল গড়ে উঠবে দশ-বারো জনের সেকশনে, এ সংখ্যা কখনও কম হবে আর কখনও বেশি হবে প্ল্যাটুনের সংখ্যায়। এবং সেটা হবে পরিবেশ, পরিস্থিতির আর শত্রুর দিক পরীক্ষা করে। চে পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে বললেন বিশেষ দরকার পড়লে বা আক্রমণ বা প্রতি-আক্রমণের সময় সৈন্যসংখ্যা কিছু বাড়াতে পারে গেরিলারা। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পনের জনের বেশি হবে না। পাঁচ জনের বেশি কোনও গ্রামে থাকা তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। আলজিরিয়ার গেরিলারা তিন-চার জনের বেশি থাকত না। রাতের আক্রমণে তারা দক্ষ ছিলো। Mosquito war—মশার যুদ্ধ ছিলো এ আক্রমণের অন্য নাম। কিন্তু গেরিলা দল গঠন করার সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক এবং ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা।

গিয়াপ বললেন ঃ·····**based on the national economy and in harmony with the practical condition of the battlefields···**

এই পরিবেশ, পরিস্থিতি ও জনসাধারণের মানসিক গঠন, সামাজিক মূল্যবোধ আর অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে জলবায়ু,

পাঠাগার
ঢাকা

ভৌগোলিক আবহাওয়ার রূপান্তরে গেরিলা রীতি ও কৌশল বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। গঠন আর চরিত্র রূপান্তরিত হয়েছে বহু দেশে বহুবার।

গেরিলা বাহিনী যে অঞ্চলে তাদের আস্তনা গাড়বে সে অঞ্চলের পথঘাট, গ্রাম ও শহরের অবস্থান এবং ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় হয়ে মিলতে হবে। চেহারায় স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সামিলতা থাকলে বিরাট সুবিধা ঃ কেননা বিপদের সময় তারা জন-অরণ্যে সবার সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। পাহাড়-জঙ্গল-নদী নিয়মিত সৈন্যদের পক্ষে বিরাট বাধা—সেজন্য গেরিলা যুদ্ধে এসব প্রাকৃতিক প্রাচীর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার সর্পিল গতি; বিস্তৃত উপনদী, শাখা-নদী ও প্রসারিত চরমালা গেরিলা-কার্য পরিচালনার বিশেষ উপযোগী। জনসাধারণের সঙ্গে চেহারা-চরিত্র, গঠন-সাদৃশ্য এবং ভাব সংস্কৃতির অন্তরঙ্গতা থাকায় বাংলাদেশে গেরিলা যোদ্ধারা সুবিধা লাভ করেছে। এ সুবিধা ইন্দোচীন ও মালয়ের গেরিলারা লাভ করেছিল গভীর অরণ্য থাকায় চীন পেয়েছিলো বিশাল ভূখণ্ড, পর্বত-প্রাচীর আর অরণ্যের সৌজন্য, ভিয়েতনামের গেরিলাদের প্রথম লালন করেছে নির্জন দুর্গম বন-পাহাড়। সিয়েরা মায়েস্ত্রার সর্বোচ্চ চূড়ায় আশ্রয়ে কিউবার গেরিলাদের বিপ্লবের রক্তিম-সাধনার দ্বিতীয় শপথ উচ্চারিত হয়েছে।

হৃদয়ের জ্বলন্ত উত্তাপে এসো স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিঁড়ে আনি।

চওড়া বুকের পাটা। লোমশ হাত ঃ শক্ত। কঠিন। দক্ষিণ কেরোলিনার এক কৃষক ঃ ফ্রান্সিস মেরিয়ন! লেখাপড়ার ধার ধারেন নি জীবনে। তেমন কিছুই বুঝতেন না। তবে বুঝেছিলেন তাঁর দেশকে—হৃদয় দিয়ে, আর মোটা চোখে দেখেছিলেন দেশকে—দেশের দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্রকে। খাঁটি দেশপ্রেমিক ঃ নিখাদ!

বিশ জনের দল গঠন করলেন। খাবার নেই। ছেঁড়া পোশাক। সামান্য অস্ত্র। এ নিয়ে মেরিয়ন যখন পথ চলতেন, নিয়মিত সৈন্যরা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতো। লোকজনও হাসাহাসি করতো।

বৃটিশরা দক্ষিণ কেরোলিনা আক্রমণ করতেই বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে মেরিয়নের দল। তাঁর দলের হাতে বিশেষভাবে ঘা খান বৃটিশ সেনাপতি কর্ণেলিয়াস। মেরিয়ন প্রায়ই তাঁর ঘাঁটি পরিবর্তন করতেন। আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু সেখানে, কখন কিভাবে তিনি আক্রমণ চালাবেন বৃটিশরা তা ধরতে পারত না।

বৃটিশ মার খেয়ে নাজেহাল হয়ে বললো: মেরিয়ন ভদ্রলোক নন। তিনি খ্রীস্টানদের মত যুদ্ধ করেন না।

মেরিয়ন ও তাঁর দলকে বৃটিশ হানাদার সৈন্যরা এত ভয় করতো যে, নিরাপদ তাঁবুর মধ্যে বসে জ্বলন্ত আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখার ছায়াকে দেখে হঠাৎ ভয়ে আঁতকে উঠতো। হাতে অস্ত্র নিয়ে বৃথাই চিৎকার করে উঠতো।

* * * *

নেপোলিয়ন স্পেন আক্রমণ করলেন, রাজাকে করলেন-বিতাড়ন। স্পেনবাসী ফরাসীদের ভয়ে আশ্রয় নিলো জঙ্গলে। জঙ্গল আশ্রয় নিয়ে তারা গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। দেশের মাটি থেকে ফরাসীদের হটিয়ে দেবার জন্য তারা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ শুরু করে। ফরাসীদের বিপুল ক্ষতিসাধিত হয়। এটা ১৮০৮ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে। তার বছর কতেক পরে নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করে। রাশিয়ার শক্ত হাড়ের চাষী, কশাক মিলে গেরিলা রীতিতে নেপোলিয়নের বিপুল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। বরফ-ঢাকা মস্কো-স্মোলেনস্কো। তুষারপাতে দীঘল গাছগুলোর পাতা নেই। পানি নেই। রোডের উপর বরফ জমেছে প্রচুর। বিপুল সৈন্যের চলাচল থেমে গেছে। এমনি এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে

হঠাৎ রুশীয় কশাক চাষীদের আক্রমণ শুরু হলো। নেপোলিয়নের বিরাট বাহিনী এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় বুঝতে পারলো এর গণসমর্থন-পুষ্ট গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের কী তীব্রতা, আর উপলব্ধি করলো এর আঘাতের প্রচণ্ডতা।

এমনি করে যুগে যুগে বাস্তব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেরিলা যুদ্ধ মুক্তিকামী মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে এক নবতর প্রত্যয়-সমন্বিত যুদ্ধরীতি—যা শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত দেশে দেশে বিপ্লবী চেতনার বাস্তবায়ন সফল।

…দেয়ালে দেয়ালে আজ লটকে দাও একটি নাম
মুক্তি পাগল রক্ত-স্নাত ভিয়েতনাম……

ইদানীং ইতিহাসে বিপ্লবী একটি নাম : ভিয়েতনাম—সারা পৃথিবীর বিপ্লবী চেতনার তড়িৎস্পর্শ : স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মনোবল আর মানসিকতার পবিত্র লালনভূমি। বিচিত্র অনুভূতির এক দেশ। মাঠের বুকে পাকা ধানের সোনালী স্বপ্নিল সঙ্গীত, তামাক-লোহা-কফি আর কয়লার অফুরন্ত সম্পদের লোভনীয় ভিয়েতনাম। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা হাত বাড়ালো ভিয়েতনামের বুকে : সায়গন শহর দখল করলো তারা ১৮৫৯ সালে। ভিয়েতনামের সম্পদে ফরাসীদের লোভ আর লালসার জিহ্বা প্রসারিত—তারা পরিচিত বিপ্লবীদের করলো নির্বিচারে হত্যা : কারাগার এড়ানোর একমাত্র পথ হলো পলায়ন!

৭-৬০৪৬
২০০
সময়

এমনই এক নিষ্ঠুর দিন-দাহ!

গুমোট আবহাওয়া। দম বন্ধ হয়ে আসবে বুঝি!

মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য।

পাখি-ডাকা-ঘুমে-ভরা একটি গ্রাম : নেগি আন হা তিন। যৌবন সেখানে অবাধ্য। জীবন সেখানে উচ্ছল। বিপ্লবী চেতনা সেখানে উন্মত্ত। জ্বলন্ত সূর্য সেখানে গলে গলে পড়ে হৃদয়ে হৃদয়ে। বাধা মানে না। বাধা মানল না তারা শাসনের আর শোষণের। গঠিত হলো বিদ্রোহী সরকার।

এগিয়ে এলো ফরাসী বাহিনী। গ্রাম জ্বল্‌ল, জনপদ পুড়লো, নগর ধ্বংস হলো। সোনার ধানের ক্ষেত পুড়ে কালো হয়ে গেলো। কাঠবিড়ালীরা অন্ধকার গুহায় মেশিনগানের অবিশ্রান্ত গুলীর

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

অনবরত শব্দে মুখ লুকালো ঃ হাজার লোক মরলো—যুবতী ধর্ষিতা হলো। সেটা ভিয়েতনামের উনিশ শ' ত্রিশ সাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যলগ্ন।

ফ্রান্সের হাড়ে জোর কাঁপুনি ঃ ঝড় এলো—

প্রচণ্ড বেগে নাৎসী বাহিনী ঢুকে পড়লো ফ্রান্সের পেটের ভেতর। প্রতিরোধ ধুলায় মিশে গেলো। পদানত হলো ফ্রান্স। স্বাধীনতা হলো বিসর্জিত। এমনি এক পরিস্থিতিতে বানের জলের মতো তড়িৎগতিতে জাপ-বাহিনী ভিয়েতনামের মালিকানার নতুন খবরদারী। স্থানীয় ফরাসী সরকার জাপ-বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলায়। শুরু হলো নতুন মালিকানার নবতর জাপ-ফরাসী অত্যাচার। জাপ সমর-কর্তারা ভিয়েতনামের যুবকদের ধরে নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রমের যাঁতাকলে আটকে ফেলে ঃ ক্লান্তির অসহ্য ভারে, কর্মের নিষ্ঠুর পীড়নে ভিয়েতনামের যৌবন বেদনায় আর হাহাকারে, ক্ষোভে আর দুঃখে অসহায় প্রার্থনায় জ্বলতে থাকে।

৭৮।৪।৮৫

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি এগিয়ে আসছে। ভিয়েতনামীদের সারা বছরের ফসল লুঠ করে নিলো সৈন্যবাহিনী। কৃষকের চালায় আগুন ধরলো। গৃহপালিত পশুদের করলো হত্যা। এমনি আবহাওয়ায় সশব্দে ফেটে পড়লো ঃ লাংগন কোচীন-চীন। বিদ্রোহ জ্বলে উঠলো।

জাপ-ফরাসী বাহিনী এগিয়ে গেলো।

ভয়াবহ বীভৎসতা। মৃতের পাহাড় জমে উঠলো।

বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সমগ্র ভিয়েতনাম।

উনিশ শ' আটচল্লিশ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর।

হ্যানয় শহরে হাজারো মানুষের অফুরন্ত উল্লাস।

স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন হো-চি-মিন।

বিপ্লবের বিজয়বার্তা সোনালী তারকা-খচিত রক্তপতাকা প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঘোষণা করলো।

শুরু হলো সংঘর্ষ।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের।

প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিন সমগ্র জাতিকে এই মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে বলিষ্ঠ আহ্বান জানালেন :

All Vietnamese, regardless of sex, age, creed, political tendency and nationality must stand up to fight the French colonialists and save the country. Those who have guns, use guns, those who have swords use swords, and those who have no swords use picks, shovels or sticks. Everyone has to do his utmost against the colonialists to save the country.

সর্বশক্তি নিয়োজিত করলো ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা।

কয়েক লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা। অঢেল অস্ত্র। শত শত বিমান। প্রচুর হেলিকপ্টার। সর্বাধুনিক ট্যাঙ্ক আর আমেরিকার ডলার—কিছুতেই কম্‌তি নেই। কোনটাতেই অসুবিধা নেই। বাড়তির চেহারায় ঔজ্জ্বল্যের স্ফীতকায় দম্ভের দীপ্তি।

অন্যদিকে ভিয়েতনামীদের ?

অস্ত্র নেই। বিমান নেই। ট্যাঙ্ক নেই। টাকা নেই।

আছে ক্ষুধা, আছে দারিদ্র্য, আছে দুঃখ আর যন্ত্রণা !—

পরাধীনতার দুঃসহ মর্মজ্বালা।

আর আছে অসীম সাহস—বিস্তৃত বক্ষপট।

আর জন্মভূমির প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা : আছে আদর্শহীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভবিষ্যৎ পরাজয়ের সম্বন্ধে অকম্পিত বিশ্বাস : হো-চি-মিনের কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি :

A colonized and weak people once it has risen up and is united in the struggle determined to fight for its independence and peace, has the full power to defeat the strong aggresive army of an imperialist country.

দীর্ঘ ন' বছর রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের সাতই মে দিয়েন বিয়েন ফু-র ঐতিহাসিক যুদ্ধে মদমত্ত ফরাসীদের

নির্মম পরাজয় তারই প্রমাণ। প্রমাণ করলো একটি ছোট দেশের জনতা ও তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ একটি জাতি আদর্শহীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাজিত করতে পারে।

ফরাসীরা গেলো।

এলো আমেরিকা তার নয়া সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে। একটি দীর্ঘ অপচ্ছায়া!

ফরাসীদের পলায়নপর দুমড়ানো জুতোর পদচিহ্ন ধরেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আমেরিকা নবতর ভাবে, চলনে এবং চেহারায়।

১৯৫৩ সালের অন্ধকার রাত।

বাতাসের শব্দে ষড়যন্ত্রের ফিসফিসানি!

আলোক-উজ্জ্বল কক্ষে পবিত্র পানীয় সামনে রেখে ফরাসী ও মার্কিন জেনারেলদের ভেতর আলোচনা চলে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ঃ **Operation Vulture.**

একটি কুখ্যাত অধ্যায়।

গণফৌজের দিয়েন বিয়েন ফু-র সাফল্যে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডালেস অস্থিরতায় আর্তনাদ করে উঠলেনঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণতন্ত্র রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব মার্কিনীদের।

তাঁরা গণফৌজের সাফল্যে উন্মাদ হয়ে ঘোষণা করলেনঃ যে করেই হোক, গণফৌজকে রুখতেই হবে।

ফরাসীদের বিদায়ের পালা।

এই পটভূমিকাকে সামনে রেখে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক জেনেভা সম্মেলন বসলো।

সাম্রাজ্যবাদীরা বললোঃ উত্তর ও দক্ষিণকে ভাগ করতে হবে।

ভিয়েতনামী প্রতিনিধি ফ্যাম ভান দং জ্বালাময়ী ভাষণে বললেনঃ মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষার্থে প্রয়োজন হলে তারা বুকের রক্তে টংকিং উপসাগর লাল করে দেবে।

অনেক আলোচনা হলো। বিতর্ক হলো প্রচুর। সমালোচনা হলো। স্থির হলো : সপ্তদশ অক্ষরেখা ধরে একটি অস্থায়ী provisional military demarcation line টানা হবে। এর উত্তরে থাকবে গণমুক্তিফৌজ এবং দক্ষিণে থাকবে ফরাসী ও মার্কিন সৈন্য। দু'বছরের ভেতরে নির্বাচনের রায়ে স্থির হবে খণ্ড-অখণ্ড প্রশ্ন।

আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন করবে এই নির্বাচন পরিচালনা। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্টের গদীতে বসলো দিয়েম। হো-চি-মিন দাবি করলেন নির্বাচন। লিখলেন চিঠি দিয়েমকে। একটি। দুইটি। কোন ফল হলো না। আমেরিকা বোতাম টিপে বলে দিলে সাক্ষীগোপাল দিয়েমকে : নির্বাচন হবে না : বানচাল কর। উপায় নেই আমেরিকার। নির্বাচন হলে জিতবে হো-চি-মিন এটা মার্কিন জানে। এতবড় পরাজয় হোয়াইট হাউস মানতে রাজী নয়। সেজন্য বাতিল।

পরে অবশ্য আইসেনহাওয়ার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"I have never talked or corresponded with a person knowledgeable in Indo-Chinese affairs who did not agree that had election been held as at the time of fighting (1954) 80 percent of population would have voted for the communist Ho Chi-Minh as their leader."

সুতরাং অন্য চোরাপথ। ষড়যন্ত্র চললো।

রাতারাতি ফিলিপাইন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান এলো।

সৈন্য এলো। শক্ত ঘাঁটি তৈরি হলো। দুর্ভেদ্য।

ভিয়েতনাম মার্কিন কলোনীতে পরিণত হলো।

চারদিকে কেমন যেন আবহাওয়া।

গুমোট। মানষগুলো যেন বোবা হয়ে গেছে।

চক্রান্ত! বিভ্রান্তি! কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনতা!

কিন্তু সংগ্রামী মানুষের আত্মা চিরদিন থেমে থাকে না।

আত্মার উত্তাপ জেগে উঠল : গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের অগ্নিশিখা পুনরায় সঞ্চারিত হলো। জনতা জেগে উঠলো। ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষ তাকিয়ে দেখলো পেছনের ইতিহাসকে, চেয়ে দেখলো দিয়েমকে, দেখলো মার্কিন চক্রান্তের কারসাজিকে। আন্দোলন পথে-পথে ফেটে পড়লো। সভা-মিছিল-পিকেটিং-শ্লোগান ভিয়েতনামের বাতাসকে আলোড়িত করে। জনগণ এক হয়। একের আওয়াজ উঠলো : দুই-কে এক করো।

সাম্রাজ্যবাদীর চিরাচরিত প্রথানুসারে দমননীতি চললো।

মার্কিন সাহায্যে গঠিত প্রায় দুই লক্ষ সেনাবাহিনী জনতার সোচ্চার দাবীর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে এগিয়ে এলো। রাইফেল-বাটের আঘাতে মাথা ভেঙ্গে চৌচির হলো অনেকের। বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হলো মেহনতী মানুষ, শ্রমিকের দেহ লুটিয়ে পড়লো রাজপথে! প্রকাশ্যে বিদ্রোহী ভিয়েতনামী যুবতীকে ধরে মার্কিন সৈন্য করলো ধর্ষণ। বিচারের প্রহসনে শত শত নরনারীকে হত্যা। বিশেষ গিলোটিনে সংগ্রামী মানুষের মাথা কাটা হলো। যুবতীর যোনিতে বিষাক্ত সাপ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো—সে এক নারকীয় নাটক। নায়ক উন্মাদ দিয়েম। ভিলেন মার্কিন। সাম্রাজ্যবাদীদের হিসেবেই ধরা পড়ে, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সন পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক লক্ষ ষাট হাজার জনকে হত্যা করা হয়েছে, প্রায় সাত লক্ষ লোক বিকলাঙ্গ হয়েছে, চার লক্ষকে বন্দী শিবিরে গুলি করে মারা হয়েছে।

অত্যাচার মানুষকে প্রতিরোধের ভাষা দেয়।

দেয় প্রতিবাদের শক্তি। সংগ্রাম মানুষকে করে ঐক্যবদ্ধ। করে তীক্ষ্ণ এবং সংযত। দিয়েমের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনতা রুখে দাঁড়ায়।

এবার পালা-বদল।

এতদিন মার খেয়েছে জনতা।

এবার মার দেবার পালা।

পাল্টা আঘাত এলো—পাহাড়ী-উপজাতি থেকে প্রত্যাঘাতের প্রতিধ্বনি শোনা গেলো। সে প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়ে সারা ভিয়েতনামে ছড়িয়ে পড়লো। জনতাই এবার অস্ত্র তুলে নিলো। গ্রাম জেগে উঠলো। শহর জাগলো প্রত্যয়দীপ্ত শপথ নিয়ে।

অন্যদিকে খেলা শুরু হয়েছে।

বাসি হয়ে গেছে দিয়েম। তাকে দিয়ে সহজে আর লোক ঠকানো সম্ভব নয়। তাই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সে দ্বন্দ্ব স্বার্থের আর ভাগের।

অন্য ভ্রাতা নগো দিনকান।

ঠাণ্ডা মাথার মানুষ।

চুপচাপ গোপাল হয়ে থাকতে ভালবাসেন।

এক বিচিত্র পেশায় আর নেশায় তিনি মেতে থাকেন।

তিনি কানের মিউজিয়াম গড়ে তুলেছেন অন্ধকার ঘরের আঙিনায়।

কান চাই—ভিয়েতকংদের কান—বিপ্লবীদের কান। কানের প্রেমিক তিনি। পাঁচ শো পিয়াস্ত্রো—একটি রক্তাক্ত বিবর্ণ—মরা কানের মূল্য।

শুধু কথার মানুষ নন তিনি।

কত ভিয়েতকংকে হত্যা করা হল তার বাস্তব প্রমাণ। কথায় ভোলার লোক তিনি নন। কাজের মানুষ!

পুরস্কারের লোভে দালালশ্রেণী নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালিয়ে কান সংগ্রহ করে। সরল মানুষকে করে প্রলুব্ধ। হুয়ের এক রেস্তোরাঁ মালিক এই লোভনীয় ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। ভিয়েতকংরা সংবাদ পেয়ে সেখানে আক্রমণ করে। বের হয় ছোট ছোট নীল খাম। অসংখ্য খামে কান—কান-দাতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বয়স, নাম, পেশা, গ্রাম ইত্যাদি লেখা পাওয়া যায়। ধর্ষিতা মেয়ের

চুল কেটে রাখত নীল খামে। পলিথিনের খামে অসংখ্য বাম কান উদ্ধার করে ভিয়েতকংরা। এমনি সব অত্যাচার দিয়েম-ভ্রাতারা নিজেরাই পরিচালিত করতেন!

অভিশপ্ত সায়গন!

অনুজ নগো দিন ন্যু আর ভ্রাতৃজায়া মাদাম ন্যু।

সমস্ত প্রভাব এবং ক্ষমতা তাঁদের কব্জায়।

নগো দিন ন্যু—এক বিস্ময়ের মানুষ!

প্রায় অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন।

ঠোঁটে একফালি ঠাণ্ডা মরা হাসি। চোখের দৃষ্টি ধোঁয়াটে—আধো জাগরণে আধো ঘুমের ছাপ তাঁর চোখেমুখে—আফিং ঠেলে দেন মুখে নিয়মিত প্রহরে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে অদৃশ্য কান লাও পার্টি ন্যুর অঙ্গুলিহেলনে সমস্ত কিছু পরিচালিত।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

মাদাম ন্যু-র সে এক অন্য মূর্তি!

আঁটসাট যৌবন-হিল্লোলিত মহিলা।

পাথরের নুড়ির উপর হিল উঁচু করা জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে গর্বের ভঙ্গিমায় বলতেন: আমার স্বামী পৃথিবীর এক মহান ব্যক্তি—Only serious strategist guerilla-war.

সাতই মে বৌদ্ধ-উৎসব।

ঐ দিনই দিয়েন ফু-র ঐতিহাসিক বিজয়-উৎসব।

মাদান ন্যু-র চাপে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে নিষিদ্ধ হলো বৌদ্ধ-উৎসব। সে নিষেধের বেড়া ভেঙ্গে বিশ হাজার লোক উৎসবের অনুমতি প্রার্থনা করে। রেডিও স্টেশনে ব্যারিকেড পড়ে, সারমন প্রচার বন্ধ হয়। এই বিরাট আবেগ-উদ্বেলিত জনতার উপর ট্যাঙ্ক চালানো হয়। নিহত হয় কয়েকজন। মাদাম ন্যু তাঁর কাগজে ছাপলেন Nine died at the hands of the Vietcong। বললেন: বৌদ্ধদের প্যাগোডায় ছদ্মবেশে কম্যুনিস্টরা কাজ করছে। বৌদ্ধ অসন্তোষ কম্যুনিস্টদের ষড়যন্ত্র। আন্দোলন থামে না। সারা

দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘট চলে। মিছিল চলে অজগরের মত ফুলে ফুলে। আত্মাহুতি দেয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। আমেরিকা দূতাবাস জোরালো প্রতিবাদ জানায়। কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য : বৌদ্ধদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

দিয়েম বৌদ্ধদের ডাকলেন।

আলোচনা হলো। পাঁচ দফা শর্ত তৈরি হলো।

এবং বেতার মারফত তা প্রচারও হলো।

নগো দিন ন্যু—অন্য মানুষ।

নির্দেশ দিলেন : শর্ত বানচাল কর।

শর্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করো। তাঁর কান লাও পার্টির অসংখ্য গুপ্তচর বাহিনী প্রচার চালালো। সঙ্কট বেড়েই চলে। আরও একুশজন বৌদ্ধ আত্মাহুতি দেন। সারা দেশে প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে।

ওদিকে জনগণের অবস্থা ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

প্রতিরোধ আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে প্রতিদিন মুক্ত এলাকা গড়ে উঠেছে। হোয়াইট হাউস থেকে ডিপ্লোম্যাট ব্যাগে খবর আসে : ধর্মযুদ্ধ রেখে দিয়েম যেন আসল কাজে মনোযোগ দেয়।

ষড়যন্ত্র চললো।

অভিনেতা জেনারেল মিন—দিয়েমের রাজপ্রাসাদে লাঞ্ছিত, অপমানিত পুরুষ। আঁতাত হলো দিন এবং অন্যান্য জেনারেলের।

চক্রান্তের মধ্যে হারিয়ে ফেললেন তাঁর দিনগুলোকে জেনারেল দিন। তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত।

কিছুটা ধোঁয়াটে আর অস্পষ্ট সে ষড়যন্ত্র।

কু-ডে-টার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হলো। তি দিয়েম ভুল করলেন। ভুল করলেন জেনারেল মিনকে বিশ্বাস করে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি ব্যাপার-স্যাপার লক্ষ্য করে বললেন : Winning the war against the Communist Vietcong would probably require change in policy and perhaps in personel in Diem Government.

নতুন পলিসি হয়তো সাজানো হয়েছিল সুন্দর করেই। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা অন্যরকম।

সে-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত ছোবল নগো দিন দিয়েমকে চোলনেব গীর্জাতে নির্মমভাবে দংশন করে!

রাজনীতির নাটক বড় নিষ্ঠুর আর বড় করুণ।

ঘন ঘন তার বদনাম।

ঘন ঘন তার রং ধরে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে দ্রুত পালা-বদলের পালা।

এ-নেতা আসে তো ও-নেতা যায়।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

বহু দালাল আর তাঁবেদার সরকারের রাতারাতি রাজপ্রাসাদে আগমন এবং ভোরের আবছা আলোয় তাদের বিতাড়নের খেলা চলতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

গ্রামের পর গ্রাম মুক্ত হতে থাকে।

জীবনের স্পন্দন-ধ্বনি ভোরের বাতাসে ভেসে এসে দিয়েমের রাজপ্রাসাদে প্রাণের আবেগে কথা কয়। দিয়েমী রাজপ্রাসাদ অস্থির হয়ে ওঠে। চঞ্চল হয়ে ওঠে হোয়াইট হাউস। বিনিদ্র রজনীতে হোয়াইট হাউস ব্যস্ত। তৈরি হলো স্টেলিটেলর পরিকল্পনা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আঠারো মাসে ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের খতম করতে হবে। আর ভিয়েতনামে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নিলো মার্কিন সমর দপ্তর—মিলিটারী অ্যাণ্ড কমাণ্ড। এদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গ্রামের পর গ্রাম তখন মার্কিন-শাসনমুক্ত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমর-নায়ক ভিয়তকংদের সাফল্যে পাগলের মত লাফালাফি শুরু করেছে—আরো সৈন্য পাঠাও, পাঠাও রসদ—আরো যুদ্ধাস্ত্র, জঙ্গী বিমান, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ।

গোলাবারুদ আর পেট্রোলের পোড়া গন্ধে, বিকৃত জীবনের যৌন-তাড়নায় ওদিককার জীবন করুণ, নিষ্ঠুর এবং নির্মম। প্রত্যক্ষযুদ্ধে মার্কিন জড়িয়ে পড়ল।

তখন মুক্ত এলাকায় জীবনের স্পন্দন। ধানের শীষে সোনালী আশার সৌরভ। সবুজ মাঠে রাখালিয়া ভিয়েতমিনের উজ্জ্বল জীবন। দ্রুত শোষণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে—পচনশীল সমাজ-ব্যবস্থা মৃত স্তূপের উপর নতুন জীবন-ব্যবস্থার গোলাপ কুঁড়িরা উঁকি দেয় —এক দিকে শোষণমুক্ত অবাধ জীবনের অধিকার, অত্যাচার-মুক্ত জীবন-প্রবাহের প্রাণবন্যা—অন্যদিকে দুর্নীতির কালো পাহাড়, শোষণের নির্মম করুণ কালো হাত, অভাব আর অনটনের নিদারুণ নৈরাজ্য, ব্যাভিচারের বিভীষিকা,—এর মধ্যে মার্কিন সৈন্যদের কল্যাণে দ্রব্যমূল্যের স্ফীতকায় চেহারা জনজীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। তার উপরে রয়েছে জোর করে তাঁবেদার বাহিনীতে লোক ঢুকানো।

১৯৬৪ সাল।

দক্ষিণ ভিয়েতনামী রাজধানী সায়গন।

মুক্তিযোদ্ধারা রাজধানীর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। অলিগলি দিয়ে চোরা গুপ্ত আক্রমণ চলতে থাকে। নিয়মিত সৈন্যবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। গেরিলা দেখা যায় না—বোঝা যায় না কোথায় তারা —আর কোথায়ই বা তারা আক্রমণ করবে। সায়গনের রাজপথে ট্যাঙ্কগুলো হাঁসফাস করতে করতে গড়িয়ে চলে। কিন্তু কোথায় তাদের লক্ষ্যস্থল জানে না—জানে না গেরিলাদের অবস্থানের সঠিক বিবরণ। সৈন্য, সাঁজোয়া-বাহিনী ট্যাঙ্ক সামনে এগিয়ে যায় তো পেছনে আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে, পেছনে ফিরে আসে তো সামনে মার্কিন রাজপুরুষদের বিরাট অট্টালিকা সশব্দে ধসে ধসে পড়ে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে। ওরা কাউকে আর বিশ্বাস করে না। প্রকাশ্য পথে-ঘাটে বের হয় না। হাজারো গুপ্তচরের দিনরাত্রির সন্ধানী দৃষ্টি ব্যর্থ। নিষ্ফল।

মে মাসে প্রচণ্ড মার খেলো মাকিন সাম্রাজ্যবাদ। সায়গন নদীর জল কেটে কেটে পনের হাজার টনের বিশাল জাহাজ পনেরটি বিমানকে পেটে পুরে এগিয়ে আসছিলো। মাকিন সামরিক অফিসার-দের মনে আশার নতুন চেতনা সঞ্চারিত হয়। কাফে রেস্তোরাঁয় তাদের সুপ্ত উল্লাস তপ্ত পানীয়ের ফেনিল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

তারপর কালো রাতের শেষ প্রহর।

পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণ। সায়গনের নদীর জল কেঁপে কেঁপে উঠলো। সেই আশার আর আনন্দের জাহাজটি সবার সামনে অতল জলে ডুবে গেলো। গভীরে।

বিয়েন হোয়ার দীর্ঘ ও বিস্তৃত এয়ারপোর্ট।

টেলিকমিউনিকেশন নেট ওয়ার্ক কল্পনাতীত।

সঙ্কেত পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে য়্যাকশন শুরু করার যাবতীয় ব্যবস্থা **সুসম্পন্ন**। প্লাটুন-লীডারের রেডিও কলের অপেক্ষায় সমস্তরকম মারণাস্ত্র নিয়ে জেটবিমান সদাজাগ্রত। ABCCC (AIR-BORNE BATTLE CONTROL AND COMMAND CENTER)-এর টেলিভিশন স্ক্রীনগুলো যখন কাজ করে, সে দৃশ্য তখন ভোলা মুশকিল। শুধু বোতামের উপর পুরো মিলিটারি অপারেশান। গ্রাউণ্ড আর্মির প্রস্তুতি আরো নিখুঁত ও সতর্ক। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা। মানুষ আর বসতি উপড়ে ফেলা হয়েছে পঁচিশ মাইল। একটি ইঁদুরের পক্ষেও বিমান-ঘাঁটির মধ্যে গোপন প্রবেশ অসাধ্য। গোটা অঞ্চল ঘিরে ফেলেছে সামরিক কনভয়। আকাশ থেকে চলে পাহারা। দংনাই নদীতে গান-বোটের আনাগোনা। সন্দেহ হলেই হেলিকপ্টার ছুটে আসে। মরা গাছের ডাল ভাঙার শব্দে মেশিন গানের অব্যর্থ লক্ষ্য ছুটে আসে। এমনি এক সতর্ক ও সশস্ত্র প্রহরায় বিয়েন হোয়ার দীর্ঘ এয়ারপোর্ট।

রাত তখন সাড়ে ন'টা।

বিয়েন হোয়ার এয়ারপোর্টের উজ্জ্বল লাল বাতিগুলো নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। উজ্জ্বল প্লাবনে বিয়েন হোয়ার রানওয়ে স্পষ্ট।

আকাশে বাতাসে স্থলের সতর্ক পাহারার দৃষ্টির চোখকে এড়িয়ে হঠাৎ বিস্ফোরণ। আকাশ কেঁপে উঠলো। বাতাস উত্তপ্ত হলো—মাটি দুল্‌ছে। দুল্‌ছে মার্কিন সমর-বিশেষজ্ঞদের উর্বর মস্তক। বিস্ফোরণ একটার পর একটা। কিংকর্তব্যবিমূঢ়! দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। জ্বলছে মার্কিনী অত্যাচারের ঈগল পাখিরা।

গেরিলাদের এই আক্রমণ এত আকস্মিক, এত অতর্কিত, এত অপ্রত্যাশিত, এত অবিশ্বাস্য যে, মার্কিন সমরবিদদের হাত থেকে নৈশকালীন স্ফূর্তির পানপাত্র সশব্দে খসে পড়ে। চারদিকে আগুন: কয়েক লক্ষ গ্যালনের পেট্রোলে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া আর আগুন, বিস্ফোরণ আর আর্তনাদ: There was no place to hide. হাসতে হাসতে আগুন আকাশে উঠছে।

এ. পি.-এর পর্যবেক্ষক উপদ্রুত অঞ্চল থেকে রেডিগ্রাম পাঠায়: It seemed that the great majority of, or even all, jet planes in Bienhoa airfield were damaged or destroyed.

ভিয়েতকং লিবারেশন ফ্রন্টের রেডিও সংবাদ দেয়: একুশটি বি-’৫৭ জেট বোম্বার, একটি ইউ-২, এগারোটি স্কাইরেডার, বোম্বার ও তিনটি জেট হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়। কণ্ট্রোল টাওয়ার ও পেট্রোল ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। দু’শ জন মার্কিন সেনা নিহত ও নব্বুই জন আহত। জন্‌সন নির্বাচনী সফর বাতিল করে হোয়াইট হাউসের দিকে মুখ ফেরালেন: How the top secret military base is attacked and by what means?

ওয়াশিংটনে রিচার্ড নিক্‌সন স্বীকার করলেন: The defeat in Bienhoa is the greatest disaster for the U. S. since its serious defeat in Pearl Harbour.

হোয়াইট হাউস ঘোষণা করলো : উত্তর ভিয়েতনামকে শায়েস্তা করতে না পারলে এ-সমস্ত 'দস্যুদের' হামলাবাজী বন্ধ হবে না।

শুরু হলো পুনরায় বীভৎস বিমান আক্রমণ। টনকিন উপসাগর ছেয়ে ফেলে মার্কিন সপ্তম নৌবহর। সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমানগুলো ছুটে আসছে—লক্ষ লক্ষ টন বোমা পড়ছে—ফাটছে—জ্বলছে গ্রাম-নগর-শহরতলী-জনপদ। বিমান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস। পাতাগুলো ঝরে গেলো—ফলগুলো শুকিয়ে গেলো—ফুলের কুঁড়িগুলো ঝলসে গেলো—বাগানের পর বাগান নিঃশেষ। ফল নেই, ফুল নেই, পাতা নেই, পাখিও ডাকে না—অন্ধকার নৈঃশব্দ্যের চেতনা। জনজীবন বিপর্যস্ত। ফুটফুটে স্কুলের বাচ্চারা আর ঘরে এলো না—স্কুল ধ্বংস হলো, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হলো। কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হো-চি-মিন ডাকলেন ভিয়েৎনামিদের। বললেন, এগিয়ে যাও, আঘাত করো সাম্রাজ্যবাদী শকুনিদের, নিশ্চিহ্ন করে ছিনিয়ে আনো জয়ের গৌরব। ভীত বা চঞ্চল আমরা নই। চূড়ান্ত জয়ের পথে এটাই শেষ বাধা। এ বাধার পাহাড়কে ডিঙিয়ে নবজীবনের সূর্য ছিনিয়ে আনো।

প্রতিরোধ-সংগ্রাম শুরু হলো।

জীবন-মরণ প্রশ্ন। রক্তের শ্বেতকণিকায় দীর্ঘায়ু জীবনের অফুরন্ত আশ্বাস নিয়ে মরণপণ সংগ্রাম শুরু হলো। ভিয়েতকং গেরিলাদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মুখে মার্কিন সৈন্য দিশেহারা। মার্কিন সৈন্য আজ তাই বাড়তে বাড়তে ছয় লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার মার্কিন যুবক প্রাণ দিচ্ছে ভিয়েতনামের মাটিতে। শতকোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে।

খোদ আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

দেশের ভিতরে এবং বাইরে প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। হোয়াইট হাউসে বিক্ষোভের উত্তাল মিছিল।

ক্লান্ত জন্‌সন তাই একদিন উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের আদেশ ফিরিয়ে নিলেন। ঘোষণা করলেন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট-পদে তিনি আর দাঁড়াচ্ছেন না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনী সরকার ও থিউ সরকার তলিয়ে যাচ্ছে। বারো শত সত্তরটি গ্রাম, সোয়া'শ ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে মুক্তিসেনারা নিজেরাই সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। হোয়াইট হাউসের যুদ্ধবাজ সামরিক পাণ্ডারা প্রশ্ন তুললেন : **And by what means ?**

—এ প্রশ্নের উত্তর মেলা দুষ্কর।

দীর্ঘদেহী পাতলা গড়নের মানুষটির সারাজীবনের নিরলস সাধনার উদাহরণে আজ ভিয়েতনামের গেরিলাবাহিনী অফুরন্ত নৈতিক বল, কর্তব্যনিষ্ঠায় তাদের চরিত্রকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেখানে তারা অনিবার্য মৃত্যুর মুখেও হাসতে হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরে মৃত্যুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। নাইলনের মই, উত্তপ্ত উপাদেয় পানীয় আর লোভনীয় নারী-মাংসের নিয়মিত অভ্যাসের ভৃত্য মার্কিনীরা চিন্তাও করতে পারে না। অন্ধকার জঙ্গলে কাদায় আর বৃষ্টিতে কচুর পাতায় চারটে কড়কড়ে ভাতে সামান্য তরকারি খেয়েই এরা তৃপ্ত।—এ এক আশ্চর্য আদর্শ। দুর্জয় এদের চরিত্রবল—দুর্মদ এদের প্রাণশক্তি—অবিশ্বাস্য এদের সাহস—পিপল্‌স আর্মি!

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

……চিংকাং পাহাড়ের একটি স্ফুলিঙ্গ
দাবানল ছড়িয়ে পড়লো তীব্র বেগে …

ওপিয়াম ওয়ার আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দুর্বল পদলাঞ্ছিত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চীনকে জীয়নকাঠির পরশে সঞ্জীবিত করে তুললেন লং মার্চের নায়ক মাও সে-তুং।

চীন-জাপানের দীর্ঘ যুদ্ধকে সামনে রেখে চীনের জনমানসের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, শত্রুপক্ষের শক্তি, বৈপ্লবিক যুদ্ধের প্রতিরক্ষাগত সমস্যার উপর দৃষ্টি রেখে মাও বিশ্লেষণ করে দেখালেন ঃ যুদ্ধজয়ের তিনটি স্তর।

প্রথম স্তরে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা থাকবে।

দ্বিতীয় স্তরে শত্রুদের আক্রমণ তীব্রতর হবে—পায়ে পায়ে এগিয়ে আসবে তারা। তারা ক্লান্ত—মুক্তিযোদ্ধারা নেবে প্রস্তুতি।

তৃতীয় স্তরে প্রচণ্ড আক্রমণ হবে শত্রুবাহিনীর উপর। জয়ের গৌরব ছিনিয়ে আনবে।

মাও জাপান ও চিয়াং-এর বিরুদ্ধে একই কায়দায় যুদ্ধ শুরু করেন। প্রথম স্তরে উত্তর ও মধ্য চীনের জাপানীরা যখন আক্রমণ করে তখন কমিউনিস্ট লালফৌজ আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে চিয়াং-এর বামে-ঘেঁষা সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মাও তাদের দলে টেনে নেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে চিয়াং নয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে মাও-অধিকৃত কিয়াংসি ফুকিয়েন অঞ্চল ঘিরে ফেলে। মাও ও জেনারেল চু-ও দেখলেন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে এক সঙ্গে সবাই পালালে চলবে না। ভেঙে ভেঙে দলে দলে পালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। জুইচিন ত্যাগ করে লং মার্চের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন তিনি। বললেন,

জুড়তে সবাইকে সমবেত হতে। মাও তাদের সৈন্যদলকে ছোট ছোট গেরিলা দলে কাজ করতে বললেন। কুয়েংমিটাং ব্যূহ ভেদ করার সময় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো। প্রায় পঁচিশ হাজার লাল-ফৌজ মারা যায়। এই ক্ষতিতে দমে গেলেন না তিনি। ইয়াংসি নদী পার হয়ে কোয়েচৌ প্রদেশের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই স্তর। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে এই দ্বিতীয় স্তরের শুরুতে অচলাবস্থা দেখা দেয়। জাপানীরা এগিয়ে আসল ক্রমাগত। অবস্থা দেখে মনে হলো সারা চীনদেশই তারা দখল করে নেবে। কিন্তু ক্রমাগত এগিয়ে এগিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সৈন্যদল জাপানী সৈন্যদলের মত ক্রমাগত এগিয়ে আসতে লাগলো। মাও তাঁর প্রধান ঘাঁটি মাঞ্চুরিয়াতে এক বিরাট সৈন্যদলকে শিক্ষিত করতে লাগলেন। মাও বললেন ঃ দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম না করা পর্যন্ত এই সৈন্যদল চুপচাপ বসে থাকবে। চিয়াং কাই-শেক ইউরোপীয় কায়দায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। ক্রমশ এগিয়ে যেতে লাগলেন—ভাবলেন চূড়ান্ত বিজয় আর দেরি নাই। তাঁরা কমিউনিস্ট চীনের রাজধানী আক্রমণ করেন। ভাল ভাল সৈন্য ও প্রচুর শক্তি নিয়োগ করলেন চিয়াং। ইয়েনান আক্রমণে লালফৌজের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে সেনাপতি চেন-ই বললেন ঃ প্রাচীন সামরিক রীতিতে উচিত ছিলো রাজধানী মুক্ত রাখা—ভাল সৈন্য নিয়োগ করা। আমরা কোনটাই করি নি।

দ্বিতীয় স্তর বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। আঘাত হানার জন্য লালফৌজ পুরো তৈরি হয়ে গেছে তখন।

জাপানীদের আক্রমণাত্মক অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। এবার পালা-বদল। পাল্টা আঘাত হানার দিন—তার আগেই সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো জাপান। জাপানীরা সরে গেলো। পরাজিত

জাপানের ফেলে-যাওয়া ছেঁড়া জুতো পায়ে গলিয়ে পেন্টাগণ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। চীনের বিশাল ভূখণ্ড আর তার অফুরন্ত সম্পদ।

সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ চললো। সাথে হাত মেলালেন জেনারেল চিয়াং কাই-শেক। জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার সময় চীন-মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। অথচ যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যে সেই সংখ্যা দাঁড়াল দেড় লক্ষে। মার্কিন বোমারু বিমানগুলো মহাচীনের আকাশে আর পীত সাগরে চক্কর কেটে বেড়াতে লাগালো। দীর্ঘ অপচ্ছায়ার কালো বিভীষিকায় মহাচীনের সারা আকাশ অন্ধকার।

শুরু হলো রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ।

মাও তাঁর পুরনো রণকৌশল অবলম্বন করলেন।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে চীন-আমেরিকা বাণিজ্য-চুক্তি হলো।

ডলারের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলো। অবাধ মার্কিন পণ্য চীনে প্রবেশ করতে থাকে। আমেরিকার সস্তা মালের কাছে মার খেতে থাকে চীনের নিজস্ব শ্রমলব্ধ বস্তুগুলো। বিমান, রেলপথ সর্বত্রই হোয়াইট হাউসের খবরদারী। চীনের খনিগুলির ইজারাও তাদের।

সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়। জাতীয় আয়ের মোটা অংশ তাতে ব্যয় হয়। সে ঘাটতি পূরণে নোট ছাপা হয়। দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি। Bureaucrat capitalist-রা তাদের জাল বিস্তার করে চলেছে, বড় মাছ ছোট মাছকে খাচ্ছে গিলে।

চন্দ্রহীন তারাকাহীন আকাশ।

নিকষকালো ঘনীভূত অন্ধকারে কবরের স্তব্ধতা।

গণবিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে।

জনজীবন বিষিয়ে ওঠে।

কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে, কৃষকরা তালিম নিচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের—পুঞ্জ পুঞ্জ বারুদে অগ্নিসংযোগের মহড়া চলছে।

সাংহাইয়ের একটি কাপড়ের কলে ধর্মঘট চলছে—

শ্রমিকরা শত চোখ রাঙানিতেও কাজ ধরতে রাজী নয়।

শ্রমিকরা অধিকাংশই নারী।

মালিকের বিরুদ্ধে তারা শ্লোগান দিচ্ছিলো।

হঠাৎ একটি ট্যাঙ্ক এলো।

কয়েক শ কুয়েংমিটাং সৈন্য ঢুকলো।

ট্যাঙ্কের কামান গর্জে উঠলো।

প্রাণহীন দেহগুলো লুটিয়ে পড়লো।

জীবিত যুবতীরা প্রাণ নিয়ে পালানোর প্রচেষ্টা করতেই তারা ধরা পড়লো সৈন্যদের হাতে। বন্য উল্লাসে তারা মেতে উঠলো। তাদের বন্যতার এই অভিব্যক্তির সঙ্গে পাল্‌লা দিয়ে চল্‌লো ট্যাঙ্কের অগ্নিমুখ দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিবমন।

গুপ্তচর বাহিনীর হাতে নিঃশব্দ পিস্তল। বিপ্লবী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ মাত্রেই শিকার। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলো। ঘুমন্ত হোস্টেলের ছেলেদের আক্রমণ করে হত্যা করা হলো। প্রাণ হারালেন অধ্যাপক ওয়েন, লি-এর মত চিন্তাবিদ্‌।

অন্যদিকে বিপ্লবের পটভূমিকা তৈরি হয়েছে।

হাজার হাজার লাঙল-ফেলে-আসা কৃষক হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল। জাতীয় মুক্তির আহ্বানে আদর্শে ও বিপ্লবে তারা শপথ নিয়েছে। প্রতিজ্ঞার দৃপ্ত গর্জন ওঠে রাইফেলের বুলেটে।

তৃতীয় স্তর শুরু হয়ে গেল।

জেনারেল লিন পিয়াও মাঞ্চুরিয়ার সংরক্ষিত ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন। মাঞ্চুরিয়া পার হলো—পার হলো সাংহাইয়ের গিরিপথ—নেমে এলো সেনাবাহিনী চীনের বিশাল সমভূমিতে। লালফৌজের বিভিন্ন দল—যারা এতদিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্রামে নগরে বন্দরে শহরে জঙ্গলে, তারাও এসে গেলো।

চিয়াং-এর মেরুদণ্ড গেলো ভেঙ্গে। কেননা, বিপ্লবের জন্ম এখানে, শহরে নগরে নয়। দূর দূর খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলিতে বিপ্লব ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় লালিত হয়। তারপর গ্রাম এগিয়ে এসে চেপে ধরে শহরকে। শহর গ্রামের নিকট তার বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়—মুক্তির মুখ চুম্বন করে। কুয়েংমিটাং-এর অত্যাচার জনগণকে দূরে সরিয়ে ফেলেছে। জনগণ তাদের কাছে ঘেঁষে না ভয়ে, ভীতিতে, অত্যাচার আতঙ্কে আর ঘৃণায়। চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর হৃদয়ে আতঙ্কের বৃত্ত---চোখের সামনে অন্ধকার—আদর্শহীন অন্ধ লড়াই—আন্দাজে গুলী ছোঁড়ে, তাদের লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই—আদর্শহীন অন্ধ লড়াই, পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে শক্তির ক্ষয়, জীবনীশক্তির অপচয়। হাঁপিয়ে ওঠে তারা—মানসিক ধৈর্য আর আস্থার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সৈন্যদলে অসন্তোষ। স্ববিরোধী ভাবনায় তারা অস্থির—নৈতিক শক্তি নিঃশেষিত।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর।

সহর্ষে পার্টি বৈঠকে মাও বললেন ঃ আমরা এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই সন্ধিক্ষণে শুধু গৃহযুদ্ধের নয়, সামগ্রিক অর্থে গত এক শত বছরের চীনে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের এক বিশেষ মুহূর্তে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী।
কুয়েংনিটাংদের শেয শক্ত ঘাঁটি শানটুং।
শানটুং লালফৌজ ঘিরে ফেললো।
সাড়ে পাঁচ লক্ষ চিয়াং বাহিনী।

হার মানল তারা। আত্মসমর্পণ করলো। দ্বিধা আর বিবেকী তাড়না থেকে মুক্ত হবার বাসনায় রাইফেল দূরে ফেলে দু'হাত উপর তুলে দাঁড়ালো।

গভীর হতাশায় মার্কিন সেনাপতি বার (Barr) লিখলেন : চোখের সামনে দেখতে পেলাম বিশাল কুয়েংমিটাং বাহিনী অবসাদগ্রস্তের মতো ভেঙে পড়লো। আমাদের অজস্র বাহিনী, ভারী ভারী ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ এবং আরো রকমারি আধুনিক সমরাস্ত্র দখল করে নিলো মাও সে-তুং-এর সৈন্যবাহিনী। ওদের আরো শক্তি বৃদ্ধি হলো।

মার্কিন মিশনগুলি চীনের মাটি ছাড়তে বাধ্য হলো। জেনারেল চিয়াং ও তাঁর হাতে গোনা অনুচর ও এতকালের শোষণ করা পুঁজি নিয়ে পালিয়ে এলেন তাইওয়ানে। সাগরঘেষা ফরমোসাতে বসে পেন্টাগণের প্রহরায় তাঁর দিন কাটে। তাইপের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে হয়তো তাঁর চোখ জ্বালা ধরে যায়—গত কয়েক বছরের দুর্বিষহ যন্ত্রণার স্মৃতি তাঁকে ভয় পাইয়ে দেয় মাঝে মাঝে মহাচীনের সীমান্ত হতে নিক্ষিপ্ত গোলা সমুদ্র পেরিয়ে সশব্দে ফেটে পড়ে ফরমোসার মাটিতে ভয়ঙ্কর আক্রোশে। চমকে ওঠেন তিনি, ভয়ানক বিচলিত বোধ করেন, অসহায় উপলব্ধিতে অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রার্থনায় পেন্টাগণ প্রভুদের নিকট তিনি আর্জি পাঠান। হোয়াইট হাউস অভয় দেন—সেভেন ফ্লিট টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে……

সমুদ্র আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা আলজিরিয়া।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শোষিত দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত।

১৯৫৪ সাল।

ন্যাশনাল লিবারেশান ফ্রন্ট—গেরিলা রীতির যুদ্ধ শুরু করে দেয় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। গেরিলাদের দমন করার জন্য ফরাসীদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে।

পঞ্চাশ হাজার থেকে সৈন্যসংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো পাঁচ লক্ষে। নির্মিত হলো বিরাট সংরক্ষিত ঘাঁটি। এলো অস্ত্র—এলো বোমারু বিমান, হেলিকপ্টার। নির্মিত হলো শত মাইলের দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া।

তিউনিসিয়া থেকে আলজিরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

কেননা, ফরাসীরা মনে করতো মরক্কো ও তিউনিসিয়া ছিল আলজিরিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক। ফলে ফরাসী সমরমন্ত্রী মরিসের নাম অনুসারে কাঁটাতারের বেড়ায় সীমান্ত ঘিরে ফেললো। এমনি সতর্কতা, এত আয়োজন ও সম্ভার, এর ভেতরে গেরিলা বাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণ।

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর।

পাহাড়ী পথ। নিস্তব্ধ!

সেই সান্ধ্য নিঃসঙ্গ পথকে খচ্চর আর ঘোড়ার খুরের শব্দে আলোড়িত করে একটি দল এগিয়ে চললো ফরাসী-সুরক্ষিত ঘাঁটি এল্ হামিদ-এর দিকে।

মাত্র পঁয়ত্রিশ জনের দল।

দলের নব নায়ক মেক্সিকান ঃ ছদ্মনাম এটা তাঁর।

বেঁটেখাটো। গোঁফওয়ালা তেজী মানুষ।

তিন ঘণ্টা একটানা পথ চলার পর সবাই এসে থামলো। এখান থেকে ,এল্-হামিদ খুব বেশি দূরে নয়। প্রায় কাছে এসে গেছে। গেরিলাদের উৎসাহ দেবার জন্য প্রচারপত্র বিলি করা হলো। তাতে ছিলো ঃ স্বাধীনতা, নয় তো মৃত্যু।

আলজিরিয়ার পর্বতমালার ছায়াগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এল্-হামিদের সার্চলাইটের তীব্র আলো যা শকুনের দৃষ্টি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। আলোর চোখ নিয়ে সন্ধান করছে বিদ্রোহী সৈন্যদের।

আবার যাত্রা শুরু হলো।

আবার থামলো। খাড়া পাহাড়।

তার তলায় এসে তারা থামলো।

মেক্সিকান তরতর করে উঠে গেল পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে। কিছুক্ষণ তাকালেন এল্-হামিদের দিকে।

আকাশে দেখলেন। নিশানা ঠিক করলেন। স্কেচ দেখলেন। তারপর হুকুম দিলেন ঃ চার্জ।

শব্দের তরঙ্গ তুলে মর্টারের সেলগুলো সশব্দে ফেটে পড়লো এল-হামিদের আঙিনায়। গেরিলারা পিছু হটলো। শুধুমাত্র মেক্সিকান পাহাড়ের উপর সেই ডালে মুখ লুকিয়ে রইলো। ফরাসীরা মর্টার চার্জ করলো।

তখন গেরিলারা ছায়াঘন জ্যোছনায় শকুনি-আলোকে পেছনে ফেলে সবাই নিরাপদ আড্ডায় ফিরে এলো। কেউ ভয় পেল না, কেউ পেছনে পড়ে রইলো না।

শুধু রয়ে গেল সেই বেঁটেখাটো তেজী মানুষটি।

আশ্চর্য হয়ে গেলো মেক্সিকান, ফরাসীরা প্রতি-আক্রমণ করলো না দেখে। গুপ্তস্থান থেকে মেক্সিকান শুধু লক্ষ্য করলো রাইফেলধারী কয়েকজন আলজিরীয় মুসলমানকে নিয়ে একটি জীপ বেরিয়ে আসছে। আর থাকতে পারে না মেক্সিকান। হাত নিশপিশ করে উঠলো। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেবার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে মর্টার চার্জ দিলো। গর্জে উঠলো সেল। ধূলিসাৎ হলো জীপ গাড়িটি। আকস্মিক এই আক্রমণে কেউ প্রস্তুত ছিল না। হতচকিত বাহিনী বিমূঢ়। নিঃশেষিত মনোবলের শক্তিহীনতার পরাজয় ফরাসীদের ললাট-লিপি!

আলজিরিয়ার গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস।

দুঃসাহসিকতার অন্য নাম শ্লীমান।

মাত্র চল্লিশ জনের দল। তাঁর দলকে সবাই বলত: যমের দল। Commandos of death। শ্লীমানের দলে ছিল সব শহুরে ছেলে। তারা বলত: আমরা হাসতে হাসতে আঘাত করি, আঘাত করতে করতে শত্রু মারি।

তারা ঝড়ের বেগে আক্রমণ চালাতো।

পাঁচ লক্ষ সুশিক্ষিত সজ্জিত সৈন্য।

অস্ত্রের অভাব নেই। অভাব নেই বিমানের।

তবু ফরাসীরা শেষরক্ষা করতে পারলো না।

শত অত্যাচারেও জনতাকে পোষ মানাতে পারলো না।

পেলো না কোন সহানুভূতি।

তাদের যতকিছু সামরিক সম্ভার ও আয়োজন সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো শুধু মরিস লাইনের ধারে।

কয়েক হাজার আলজিরীয় গেরিলা সৈন্য বেপরোয়া—ঝড় তারা বাধা মানে না, মৃত্যুকে ডরায় না—দিনে দিনে ধীরে ধীরে শত্রুদের

শক্তিকে শেষ করে নিয়ে আসে। শক্রর মুহূর্তে জয়লাভের অসম্ভব বাসনাকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সীমানায় ঠেলে দিয়ে গেরিলারা তাদের মনোবলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে আলজিরিয়ায় ফরাসী অধিবাসী ও ফরাসী সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের মেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সেই দ্বন্দ্বের মেঘ সেনাবাহিনীকে আচ্ছন্ন করে। বাধ্য হয়ে ফরাসী সরকার সন্ধি করে।

সন্ধির শর্ত দাঁড়ায়ঃ স্বাধীনতায়।

মহানগর পাঠাগার ঢাকা

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

…… স্বাধীনতা মেনে নিলে ? আমরা তা চাইনে।
স্বাধীনতা দিয়ে দিলে ?—ওটা তোমাদের জন্য রেখে দাও !
স্বাধীনতা ভিক্ষায় মেলে না—লাল হৃদয়গুলো স্বদেশকে তুলে দাও…

রাত গভীর।

কিউবার জনশূন্য রাজপথ ঘুমে লম্বিত।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ !

দমকা দমকা হাওয়ার টানে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

এমনি এক ভয়ঙ্কর রাতে ষড়্‌যন্ত্রের হাত এগিয়ে এলো।

নির্বাচন বানচাল হলো।

সংবিধানকে দুমড়ে ফেলা হলো।

লাখো লাখো মানুষের নির্বাচনী রায়ের সোচ্চার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়ে বাতিস্তার চিৎকার বেতারে ভেসে এলো।

সারা দেশের মানুষ থমকে গেলো।

তার পরের ইতিহাস অশেষ অত্যাচার আর অফুরন্ত নির্যাতনের কাহিনী। এই অত্যাচারের ইতিহাসের গর্ভ হতে ফিদেল কাস্ত্রোর আবির্ভাব !

হৃদয়ে তাঁর মানুষের প্রতি অশেষ মমতা ; মনে তাঁর জেল-জুলুম-কারাগারের দুঃসহ স্মৃতির যন্ত্রণা—চেতনায় তাঁর বিদ্রোহের ব্যর্থতার অদমিত বিক্ষোভের জ্বালা : এই নিয়ে ফিদেলের জীবনের শুভযাত্রা।

পনেরো বছর কারাগারের মাত্র বাইশ মাস পূর্ণ হলো।

আওয়াজ উঠলো : ফিদেলকে মুক্ত করো।

বাতিস্তা জনপ্রিয়তা চাইছিলেন। ঘোষণা করলেন : কারাগারের দ্বার খুলে দেওয়া হবে। বললেন : নির্বাচন হবে।

ফিদেল মুক্ত হলেন ;

পুনরায় বিপ্লবী প্রচার ও পরিকল্পনা চললো।

আবার শুরু হলো ফিদেলের অন্বেষণ—খুঁজে বের করো, হাজারো সন্ধানী দৃষ্টি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ফিদেলকে গ্রেফতার করো।

ফিদেল তখন মেক্সিকোয়।

নেকড়ের চোখদের ফাঁকি দিয়ে সেখানে দেখা করলেন পলাতক বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে। গেলেন টেকসাসে—দেখা করলেন বাতিল প্রেসিডেন্ট প্রিয়োর সঙ্গে।

নিভৃতে আলাপ।

সতর্ক আলোচনা।

প্রিয়ো ফিদেলকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন : কিউবার স্বাধীনতায় আমাকেও গ্রহণ করো।

ফিদেল মৃদু হাসলেন।

প্রিয়োর নিকট হতে প্রচুর অর্থ নিলেন।

অর্থের বড়ো প্রয়োজন—বিপ্লবী আদর্শের জন্য, সংগঠনের জন্য।

মেক্সিকো শহর থেকে প্রায় বিশ মাইল পথ। দুর্গম জনশূন্য। সান্টারোসা—বিপ্লবী শিক্ষার তীর্থস্থান রূপে বেছে নিলেন ফিদেল। শিক্ষক হলেন : এ্যালবার্ট বেয়ো। ছাত্র হলো আশি জন।

সেই দুর্গম নির্জন স্থানে শিক্ষা চললো। রাতে, দিনে, তিন বছরের শিক্ষা তিন মাসেই রপ্ত করতে হবে।

ফিদেল প্রোগ্রাম দিলেন : পনেরো ঘণ্টা অনুশীলনের। বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের রাজনীতি, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক চক্রে যোগদান করতে হবে প্রত্যহ।

আর বৃদ্ধ কর্নেল—বেয়ো : প্রাণে তাঁর যৌবনের জোয়ার। প্রতিটি বিপ্লবীকে পৃথক পৃথক শিক্ষা দেন : ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

হাতে-কলমে শিক্ষা দেন—মলটোভ্ ককটেল কাকে বলে ? হাতবোমার আধুনিক মালমসলার মত বড় বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব—ব্রিজ ধ্বংস করার সহজ পন্থা কি—রাক্ষুসে ট্যাঙ্ক কিভাবে ধ্বংস করা যায় ; বিমানবহরের হদিস করা কিভাবে যায় এবং তাকে বিধ্বস্ত করার উপায় কি ? ধুম্রজালের আড়ালে কিভাবে সামনে এগুনো যায়—আহত সাথীকে কিভাবে শত্রুব্যূহ থেকে মুক্ত করা যায়, ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের কিভাবে বন্দী করা যায় ঃ চালকোর নির্জন সাণ্টারোসার গোপন আস্তানায় রাতদিন প্রস্তুতি চলতে থাকে।

নভেম্বরের শীত আকাশ।

বেলা দু'প্রহর। কুয়াশার হাল্কা ধোঁয়ায় কনারা ক্যারিবিয়ানের শতধা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় জলযান গ্রানমা চলছে ঃ বিরাশিজন গেরিলা বিস্তৃত আকাশ আর প্রশান্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবছে ঃ ভাবছে কিউবার কথা। মানুষের কথা।

বিশাল জলরাশি আর নীল আকাশের থেকে দূরবীণ সরিয়ে এনে সহযোগীদের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে ফিদেল বললেন ঃ সারা কিউবা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বন্ধুরা, স্বদেশের শপথ ঃ ফিরবার পথ নেই ঃ হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু।

গন্তব্যস্থান ঃ নিকিউরো।

কিন্তু গ্রানমা হঠাৎ কাঁদায় আট্‌কে গেলো।

বাতিস্তার নেকড়েগুলো সন্ধান পেয়ে গেলো।

সৈন্য ছুটে আসছে। বিমান চলে আসছে।

অন্ধকার অজানা পথ। খাদ্য নিঃশেষিত। পানীয় জল নিঃশেষিত। জঙ্গল জায়গায় ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ নেই। বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছে। জলযান ধ্বংস হলো। পালাবার পথ নেই। দুঃসহ যন্ত্রণা। নতুন কিউবার ইতিহাস তৈরি হচ্ছে ঃ Historical experience is written in blood and iron.

মিষ্টি আখের রসে নোনা রক্তের স্বাদ।

পাথুরে জমিতে বুক ঘষে ঘষে ফিদেল সহকর্মীদের ফিরে পেলেন। চে-র জামা রক্তে ভেজা। হাঁপানীর কাশিটা চেপে ধরেছে। রাউল কাস্ত্রো গুণে দেখলো জীবিতের সংখ্যা বারোজন।

ফিদেল ভরসা দেন। বললেন ঃ আমরা যুদ্ধ করবো। বিপ্লব আনবো। কিউবাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করবো।

সিয়েরা মায়েস্ত্রার সর্বোচ্চ চূড়ায় নির্জন আশ্রয়ে আবার বিপ্লবী মন্ত্রের দ্বিতীয় দীক্ষার শপথ।

সময় বসে থাকে না।

একটার পর একটা ঘটনা। ঘটনা দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যায়। ফিদেল-বাহিনী পাহাড়ী নির্জনতাকে পিছু ফেলে গাঁয়ের মানুষের কাছে আসে। প্রীতির হাত বাড়ায়। সৌজন্যে আর বিনয়ের বিগলি ব্যবহারে জনগণ অবাক হয়। সৌহার্দ্যের আর প্রেমের আহ্বান একমুখ দাঁড়িয়ালা সেনাদের মুখে। জনতা বিস্মিত হয়। সেনাবাহিনী চিরদিনই জণগণের জীবনে ত্রাসের বস্তু। কিন্তু এরা কারা? মার্কিন পোশাকের ছোট ছোট দলের সেনারা ভয় দেখায় না—ভালবাসে। অত্যাচার করে না—আদর করে। খাবার কেড়ে খায় না—শুকনো রুটি হাসতে হাসতে ভাগ করে খায়। জনগণের মন তারা কেড়ে নেয়; হৃদয় জয় করে নিয়েছে। জনগণের সহায়তায় আর সহযোগিতায় জনগণের আশ্রয়ে আর নির্ভরতায় আক্রমণ চলে।

ব্রিটিশ ব্যবসা অচল।

শত মিলিয়নের মার্কিন নিকারো নিকেল প্ল্যান্ট বাজেয়াপ্ত।

সেন্ট্রাল হাইওয়ে আক্রান্ত।

বিদ্যুৎ জ্বলে না।

কলের চাকা ঘোরে না।

টেলিফোন বিফল।

ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট জ্বলছে!

গ্রামে শহরে হাজারো ফিদেল-বাহিনী ছড়িয়ে পড়ে।

চে আর কামিলো লা-ভিলকার আঠারটি শহর দখল করে। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে রাউল কাস্ত্রো আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

ওরিয়েন্ট প্রদেশের বাতিস্তার সময়-সচিব জেনারেল ইউ লোজিত কান্টিল্লো, জেনারেল পেডরাজা নতমস্তকে হেলিকপ্টার নিয়ে ফিরে এলো। সেনাবাহিনীর মনোবল নেই। যুদ্ধ শেষ।

আলোচনার প্রশ্ন উঠলো।

ফিদেল বললো ঃ আলোচনার প্রশ্ন অবাস্তব। আত্মসমর্পণ করুন।

তারপর ?

২৩শে জুলাই সকল বিপ্লবের মহান সঙ্গীত বেতারে ভেসে এলো। ফিদেলের কণ্ঠস্বর ক্যারিবিয়ানের উত্তাল জলরাশিকে আলোড়িত করলো নতুন জীবনের স্পন্দন-স্পর্শে।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

গেরিলা যুদ্ধ হলো সবচেয়ে সস্তার যুদ্ধ! এটি হলো একটি সুবিধাবাদের যুদ্ধ। সুবিধা দেখলে আক্রমণ করো, আঘাত করো—আঘাত করতে না পারলে ব্যতিব্যস্ত করে তোল। বিপদ বুঝলে কেটে পড়ো। আত্মগোপন করো। কিন্তু এই সুবিধা ও সস্তার সুযোগকে ঠিকমত পরিচালনা করতে না পারলে এ-যুদ্ধে সফল হওয়া যায় না। এ-যুদ্ধের দু'টি মারাত্মক বিপদ সম্বন্ধে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মাও বললেন ঃ দলের মধ্যে কেউ বীরত্বের আকাঙ্ক্ষায় উল্লসিত হয়ো না। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের প্রয়োজন, কিন্তু বীরত্বে গর্ব অমঙ্গল। তোমার দল নিয়ে তুমি দলের সঙ্গে মিশে থাকবে, তাদের দুঃখের সময়, তাদের বিপদের সময় মিশে থেকেও একক মহিমায় তোমার দীপ্তি থাকবে স্বতন্ত্র—যেমন দিনের আকাশে রাতের তারারা লুকিয়ে থাকে এক হয়ে অভিন্ন হয়ে।

অন্যটি হলো ঃ একটুতেই যুদ্ধ ছেড়ে পিছু হটার প্রবণতা। বীরত্বের প্রতি যেমন কোন অর্থহীন মোহ থাকবে না তেমনি থাকবে না অযথা পিছু হটার মারাত্মক মানসিকতা। এতে তোমার দলের মানসিকতা নষ্ট হয় মনোবল ভেঙে পড়ে—দেখাদেখি অন্যদের ভেতরেও এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি সংক্রামিত হয়। সুতরাং গেরিলাযুদ্ধের প্রথমদিকে ক্ষয়ক্ষতির রিস্ক্ কম নেবে। যখন দেখবে শত্রু হাতের মুঠোয়, যখন দেখবে লক্ষ্য অব্যর্থ, যখন জয় সম্পর্কে মনে কোন দ্বিধা নেই—তখন আক্রমণ করবে। আঘাত করবে। আঘাতে শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে দেবে—তাদের নির্মূল করবে।

ফিদেল বললেন ঃ আঘাতের পর আঘাত হানো। ঘুমাবার সময় দেবে না। আঘাত করো—সময়ে-অসময়ে, সুযোগ পেলেই

শত্রু-মনে ধারণা সৃষ্টি করো—আতঙ্ক আর ত্রাসের ভূত ঢুকিয়ে দাও—বিভীষিকা দেখুক, প্রদীপের লম্বা ছায়া দেখে আঁতকে উঠুক, গাছের পাতার শব্দে চমকে উঠুক, মেঘের গর্জনে গুলী ছুড়ুক—পরিবেশ সৃষ্টি করো যাতে ভাবে বৃত্তাকারে তাদের ঘিরে রেখেছো। আঘাত হানো, তীব্র আঘাত—তাদের পাগল করো—বিবেচনা লোপ হোক, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তাদের নির্মূল করো। দুর্গম স্থান দখল করো দিনে-রাত্রে। সহজে শত্রু আসবে এমন জায়গায় আঘাত করো, আক্রমণ করো রাতে।

পাঠাগার
ঢাকা

চে লিখলেন : নৈশ যুদ্ধ হচ্ছে গেরিলাদের পক্ষে নিরাপদ। এতে গা বাঁচার সুবিধা আছে—অহেতুক দায়িত্বও নেই। তাই নৈশযুদ্ধের জন্য রাতে পথ চলার কৌশলে পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে। দিনের-বেলায় লুকিয়ে থাকো—আত্মগোপন করো—যুদ্ধকে এড়িয়ে চলো। রাতে আক্রমণ করো। গেরিলাদের সে আক্রমণ হবে টাইফুন ঝড়ের মতো—ক্ষিপ্রগতি। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে—তাদের ভাবতে দেবে না—ভাববার অবসর দেবে না—ভেবে কিছু করার কাজ শেষ করতে হবে। গেরিলাদের গতি হবে ক্ষিপ্র, য়্যাকশন হবে তীব্র, শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হবে ব্যাপক। তুমি চেতনার নীল আকাশ—কোনও করুণার বৃষ্টিপাতে বিগলিত—অধীর বজ্রের কাঠিন্যে শক্তিমান। জনগণকে ভালবাসায় তুমি বৃষ্টির করুণা আর শত্রু-আক্রমণে বজ্রের ভয়ঙ্করতা। শত্রুর আক্রমণে তোমার চেতনার মেঘ থেকে বৃষ্টি নয়, বজ্র কেড়ে নাও, শত্রুকে আঘাত হানো।

তোমার ধৈর্য হারালে চলবে না। ধৈর্য হারাবার কারণ নেই। কারণ তোমার যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ—জনতার যুদ্ধ। জনগণ তোমার পাশে, তাদের মঙ্গল-ঘন্টার আশীর্বাণী তোমার মাথার উপর বাজছে। তোমার ভয়ের কিছু নেই—হারাবার কিছু নেই। তুমি সংগ্রাম করছো নীতির জন্য, আদর্শের জন্য—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে।

তোমার নিরাশার কিছু নেই—ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার কারণ নেই। তোমার ধৈর্য হবে পাহাড়ের মত—স্থির—অচঞ্চল। য়্যামবুশে বসে আছো : থাকো, শত্রু আসছে না : দিন গোনো। অবহেলা করো না—সতর্ক থাকো। ধৈর্য হারাবার কিছু নেই। গেরিলারা ধৈর্য হারায় না—স্বাধীনতা—সংগ্রামীদের হতাশার বাতাস স্পর্শ করে না। শত্রু আসছে সুবিধা দেখছো—আঘাত হানো : সে আঘাত অব্যর্থ হওয়া চাই। তার জন্য ধৈর্যের অনুশীলন চাই : ধৈর্য হারালে চলবে না : হো-চি-মিন বললেন : Wait, until condition mature.

গেরিলা হতে চাও : নিয়ম মানতে হবে—নীতি মানতে হবে। নিয়ম ও নীতি যার নেই—সে গেরিলা নয় : ডাকাত। তোমার মূলধন কি? গেরিলাদের আদর্শ, যাদের তারা বলবে : শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা না মানলে তোমার বীরত্ব বৃথা—আদর্শ মূল্যহীন—শৃঙ্খলা তোমার মানতে হবে—মেনে সেভাবে চলতে হবে।

তুমি গেরিলা—তোমার বিশ্বাস পজিটিভ্ য়্যাকশনে। পজিটিভ্ য়্যাকশনের জন্য প্রয়োজন ইনিসিয়েটিভ্। কর্ম সম্পাদনার স্বাধীনতা দিতে হবে—তোমার ইচ্ছার স্বাধীনতা, পরিকল্পনা ও আক্রমণের স্বাধীনতা সময় ও সুযোগের স্বাধীনতা তোমায় দিতে হবে। ব্যক্তি-উদ্যোগ শৃঙ্খলার পরিপন্থী নয়। তোমার উদ্যম, তোমার উদ্যোগ, তোমার তৎপরতা সব কিছুই তোমার তৈরি মানসিকতায় এতদিন ধরে যে-শৃঙ্খলার অভ্যাসকে লালন করেছ তার থেকে উদ্ভূত—যার অন্য নাম : conscious discipline—যার অর্থ হলো গিয়াপের ভাষায় : When we speak of conscious discipline, it means that it is built up on the basis of political consciousness of the officers and men, and the most important method for maintaining discipline is education and persuasion, thus making the army-men of their own accord, respect and remind each other to observe discipline.

চে বললেন : মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনে সবচেয়ে বড় নীতি হলো শৃঙ্খলা মেনে চলা। শৃঙ্খলা যদি মেনে না চলো, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিপন্ন হবে, শৃঙ্খলা না মানো, অশান্তি আসবে, আর অশান্তি হলেই সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে—শান্তির ঐক্যতে ফাটল ধরবে : These disagreeable incidents among the comrades are spoiling our work.

সেজন্য শৃঙ্খলা তোমার মানতে হবে কঠোরভাবে।

নিয়মানুবর্তিতা তোমায় পালন করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে।

রাশিয়ায় কোমিনো গ্রামের গ্রিশ্চিন। গঠন করলেন অন্যান্য বিপ্লবীদের সহায়তায় বিরাট গেরিলা বাহিনী। তাঁর দলের ভেতরে ভয়ঙ্কর রকমের শৃঙ্খলা এবং কঠোর নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর লেখার উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে—শৃঙ্খলা আর নিয়মভঙ্গকারীদের কী কঠোর শাস্তি দিতেন--

জানুয়ারী ১৯, ১৯৪৩ : দলের গুপ্তচর আন্দ্রে জেস্কেবভাকে গুলী করে মারা হবে, কারণ তাকে বারবার বলা-সত্ত্বেও সে শত্রুপক্ষের অবস্থান ও শক্তি পরিমাপের কাজ করে নি।

মে ১১, ১৯৪৩ : বারবার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে সাতটি নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। দলের নিকট মেয়েগুলি বোঝা-স্বরূপ। এদের গুলী করে মারো।

সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৪৩ : প্ল্যাটুন লীডার লুকদানভ মদ খেয়ে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করেছিলো। তাকে গুলী করো।

অক্টোবর ১৩, ১৯৪৬ : নিজেদের ইচ্ছামত পোজিশন ত্যাগ করার জন্য স্কোয়ার্ড লীডার বাচারেভকে গুলী করা হবে।

শৃঙ্খলাবোধ তোমার সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে ওঠা উচিত—নতুবা সার্থক গেরিলা হওয়া তোমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

তোমরা বাহিনীকে অত্যন্ত কঠিন পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হবে : কাজ করতে হয় পেছনভাগ শূন্য রেখেই, মোকাবিলা করতে হবে দুর্বল শক্তি নিয়ে বৃহৎ শক্তির সঙ্গে। কেন্দ্র থেকে তোমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে—বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি : সুতরাং তোমার উদ্যোগ থাকা অনিবার্য। মাও বলেন : উদ্যোগের অর্থই হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার স্বাধীনতা। সুতরাং গেরিলাদের কার্য পরিচালনার জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন। আর এ স্বাধীনতা শৃঙ্খলার পরিপন্থী নয়।

আর এ উদ্যোগের স্বাধীনতা না থাকলে—তুমি নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়বে—আর এ নিষ্ক্রিয়তায় আসবে হতাশ--আসবে পরাজয়—মনে আসবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা।

মাও বললেন : গেরিলাযুদ্ধের উদ্যোগপর্বটি মূর্ত হয়ে ওঠে বিক্ষিপ্তকরণ, সমাবেশ ও স্থান পরিবর্তনের নমনীয় কৌশল গ্রহণের মধ্যে, আর অনমনীয়তা ও গড়িমসিভাব নিশ্চিন্তভাবে নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে আসে এবং অহেতুক ক্ষতি ঘটায়।

তুমি গেরিলা, তোমার পরিবেশ, পরিস্থিতি দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিজ্ঞতার সঙ্গে—কী করে, কেমনভাবে, কখন গেরিলা বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করবে—ছড়িয়ে দেবে, সমাবেশ ঘটাবে কিংবা সরিয়ে নেবে। এটা সহজ কাজ নয়। চেতন মন নিয়ে গোটা পরিস্থিতিটা অনুধাবন করে যথোপযুক্ত সময়টি নির্বাচনের বিজ্ঞতার মাধ্যমেই তোমার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিজয় ছিনিয়ে আনতে চাও—যুদ্ধের পরিকল্পনা চাই। আর পরিকল্পনার জন্য চাই উদ্যোগ।

গেরিলাযুদ্ধ এলোমেলো ভাবে হয়—যারা তা বলে তারা এ-যুদ্ধের মর্মবাণী বোঝে না। প্রতিটি আক্রমণের পূর্বে অগ্রিম ও

অগ্রণী প্রস্তুতি সঠিক আছে কি না পর্যালোচনা করতে হবে। জনসাধারণের সাহায্য ও তার যথাযথ ব্যবহার, রাজনৈতিক শিক্ষা, পরিস্থিতির মূল্যায়ন, কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ—এসব সচেতনভাবে বিচার করতে হবে—সযত্নে পরীক্ষা করতে হবে। শত্রুর শক্তিকে হাল্কাভাবে গ্রহণ না করলে ঠকার সম্ভাবনাও কম। 'নিয়মিত যুদ্ধের মত চুলচেরা পরিকল্পনা গেরিলাযুদ্ধে প্রয়োজন নেই ; কিন্তু পরিকল্পনা প্রয়োজন। এবং এ-ছাড়া যুদ্ধ-বিজয় অসম্ভব। আর এ পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে গেরিলাদের উদ্যোগ গ্রহণ। নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কেন্দ্র থেকে নির্দেশ আসছে না, তোমার কাজ হবে শত্রুর পশ্চাৎভাগ দখল করা, শত্রুবাহিনীর কিছু কিছু অংশকে আটকে রাখা, সরবরাহ-পথ ধ্বংস করা, পর্যবেক্ষক পরিচালনা, সংবাদ সংগ্রহণ ও প্রেরণ—নিজের উদ্যোগেই এসব করতে হবে।

মাও বললেন : গেরিলা দলের পক্ষে কুঁড়ের মতো বসে থাকা, নড়া নেই, চড়া নেই, নেই লড়াই করা, যুদ্ধ না করে ঘুরে বেড়ানো অচিন্তনীয়। গেরিলা নায়ক ও বাহিনীকে তার নির্দেশিত ঘাঁটি-এলাকা ছাড়া উচিত নয়—যদি-না তারা নিশ্চিত হয় শত্রুর তীব্র আক্রমণে ঘাঁটি বিধ্বস্ত হবে। গেরিলা-দলপতিকে সমতল ভূমিতে বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে—ছোট ছোট দলকে 'য়্যাকশনে' রেখে বাকী বাহিনীকে আড়ালে রাখতে হবে এ পরিস্থিতিতে। শত্রুর প্রধান বাহিনী ঘাঁটি-এলাকা ছাড়লেই পুনরায় তারা বের হয়ে আসবে এবং কাজ শুরু করবে।

গেরিলা হতে চাও, ভালো কথা—স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে চাও, আনন্দের কথা—দেশের জন্য প্রাণ দিতে চাও, গর্বের কথা। কিন্তু তার জন্য গেরিলাযোদ্ধাসুলভ মনোভাব অর্জন করতে হবে—দেহের দিক ও মনের দিক থেকে। এই মনোভাবটাকে ফিদেলের গেরিলারা বলতো : esprit de corps.

সামরিক যোগ্যতার তারতম্যটা বড় নয়—বড় হলো মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর উদ্দেশ্যের সততা-একমুখীনতা আর একাগ্রতা।

চে বললেন: গেরিলা হতে চাও, কয়েকটি গুণ অর্জন করো। আত্মসংযম সাধনায় তোমায় পাথরের মতো হতে হবে, ত্যাগ আর তিতিক্ষার আলোকে অগ্নিদাহ তোমার নিকট তুচ্ছ হবে—কষ্টসহিষ্ণুতায় তোমায় মৃত্তিকার গুণ লালন করতে হবে হৃদয়ে, দেহে। আর থাকবে তোমার রাজনৈতিক আদর্শ, বৈপ্লবিক মন, বলিষ্ঠ চেতনা আর দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ। তোমার শিখতে হবে কেন যুদ্ধ, কিসের জন্য যুদ্ধ—যুদ্ধের প্রয়োজন কি—এরে জনগণের লাভের দিকটা কি? অর্থাৎ তোমার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বুঝতে হবে, দেশ আর দেশের মানুষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে তোমার। চে বললেন: গেরিলারা কথা বলবে কম—কাজ করবে বেশি। বাইরের লোককে কখনও নিজের কথা বলবে না। নতুন লোক এলে তাকে সন্দেহ করবে। তোমার যাতায়াতপথ, তোমার যুদ্ধপরিকল্পনা কাউকে বলবে না। মনে রাখবে, তোমার শত্রু তোমার পেছনেই আছে। একটি ভুলে শতপ্রদীপ নিভে যেতে পারে।

গিয়াপ বললেন: গেরিলাদের হতে হবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তোমার যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আর বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে। তোমার দেশ তোমার কাছে বড়—তোমার দেশের বাতাস মায়ের হাতের সান্ত্বনার স্পর্শ—দেশের গাছপালা সবুজ শোভন মাঠ—মৃদুল হাওয়ার মেঘ-বৃষ্টির আকাশ তোমার 'চেতনার ধনধান্য এবং অন্ধকারের প্রদীপ'। নরম নদীর কুয়াশার নীরব মিছিল—আম-কাঁঠাল বন, হিজলের সারি, বড় ছাতিম পাতার নীচে ভোরের দোয়েল পাখি, নদীর রূপালী জল তোমার হৃদয়ের তীরে এসে কথা বলবে। তোমার দেশ সে এক অন্য কথা, অন্য নাম—তোমার কামনার ধন হৃদয়ের ইচ্ছার অরণ্যের নির্ঘুম আর্তি।

দেশ আর তার মানুষ। প্রকৃতি আর তার অপরূপ রূপভঙ্গিমা—এ দেশকে তোমায় মুক্ত করতে হবে—মুক্ত করতে হবে বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে, দস্যু-বাহিনীর হাত থেকে। তোমার দেশ আজ ধষিত, তোমার আঙিনায় আজ আগুন, তোমার ফুলের বাগান শুকিয়ে গেছে, গাছের পাতা ঝরে গেছে, ফুল নেই—ফল নেই—ভোরের বাতাসে ধানের সৌরভ নেই—ক্ষেতে আগুন—গোলাভরা ধান লুণ্ঠিত—তোমার চেতনার অগ্নিবাণে, প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিজ্ঞায় তোমায় অস্ত্র তুলে নিতে হবে : দেশকে ভালবেসেছ বলে, দেশকে হৃদয়ের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছ বলে—মানুষকে আপন করেছ বলে। তাই তোমায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। হতে হবে চলমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, জনগণের জন্য সবকিছু—জনগণের প্রাথমিক চাহিদার প্রতি তোমায় লক্ষ্য রাখতে হবে।

দেশে দুর্ভিক্ষ-মহামারী দেখা দিয়াছে, তুমি মুক্তিযোদ্ধা—এগিয়ে যাও। জনগণের পাশে দাঁড়াও। সাইক্লোন হয়েছে—বিধ্বস্ত অঞ্চল গড়ে তোলো—ছিন্নমূল মানুষের পাশে দাঁড়াও—তাদের সাহায্য করো। ধনীদের নিকট হতে সাহায্য নাও—গরীবদের ভেতর বিলিয়ে দাও : তোমাদের আদর্শের কথা বলো, উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত ধারণা দাও। জনগণের উপকারের জন্য তোমরা কী করতে চাও তা তাদের জানিয়ে দাও—জনগণের ভালোর জন্যে তাদের কাছে যা বলবে—তা করবে—বাস্তব প্রয়োগে তা দেখিয়ে দেবে। তুমি মুক্তিযোদ্ধা—তোমার বিশ্রাম নেই—সমাজ-সংস্কারের আদর্শ স্থাপন করেই তোমায় ক্ষান্ত হলে চলবে না। চে বললেন : **He ought also constantly to give orientation in ideological problems explaining what he knows and what he wishes at right time.**

কোনো এলাকা মুক্ত হলো—তোমার কাজ বেড়ে গেলো। তোমাকে উন্নয়নমুখী কাজে লাগতে হবে—আবার যুদ্ধের ময়দানেও

থাকতে হবে। শত্রুর প্রতি তোমার দৃষ্টি থাকবে, নজর থাকবে বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি। প্রশাসনিক কাজ চলছে, তোমায় এগিয়ে আসতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে তোমায়, তোমার রাতের বিশ্রাম বিধ্বস্ত—যোগোযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, মুহূর্তের আয়াস বিনষ্ট।

গিয়াপ বললেন : In the free zones, the guerrilla units effectively fought the enemy and kept watch on traitors ; they were effective instruments for the local administration and local party ; at the same time, they were the shock-force in production and in transport and supply.

শুধু তাই নয়, সমগ্র দেশ হানাদার-মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কর্মধারা পরিবর্তিত হবে—পরিবর্তিত হবে অর্থনৈকিত পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আর কৃষিবিপ্লবের পথ অভিমুখে। তোমার নিরলস সাধানায় স্বাধীনতার সূর্যকিরণ ছড়াবে প্রচণ্ড দীপ্তিতে।

তুমি নিবেদিত-আত্মা—জাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত এক মহান প্রাণ!

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

তোমার অস্ত্র নেই—তাতে দুঃখ নেই, হাতে আধুনিক যুদ্ধসম্ভার নেই, তাতে কিছু আসে যায় না—উন্নত ধরনের সফিসটিকেটেড আর্মস্ নেই—তাতেও নিরাশ হবার কিছু নেই। যুদ্ধ করার জন্য তোমার মানসিকতা আছে কি না—তোমার মন এবং মেজাজ তৈরি কি না সেইটেই বড় কথা। যুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োজন—কিন্তু অস্ত্রই যুদ্ধ করে না—যুদ্ধ করে মানুষ আর তার মানসিকতা। শুধু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে জেতা গেলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো।

মাও বললেন : In war, it is not the weapon that fights but the minds of men.

যুদ্ধের জন্য চাই পরিপূর্ণ মানসিকতা—চাই অকুণ্ঠ গণসমর্থন—চাই নির্ভেজাল সহানুভূতিশীল মন।

তোমার বিশাল পেশাদারী সেনাবাহিনী নেই—ঘাবড়াবার কিছু নেই। কারণ পেশাদারী সৈন্য জনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না। যদি তোমার হৃদয় এ বিশ্বাসের আস্থাকে লালন না করে, তুমি গেরিলা নও।

চে বললেন : Whoever does not feel this undoubted truth, cannot be a guerrilla fighter. ঝকঝকে অস্ত্র নেই—উতলা হবার কিছুই নেই—জমকালো আঁটসাট পোশাক নেই অর্থ, শক্তি নেই—বেদনার্ত হবার কারণ নেই, তোমার ট্যাঙ্ক নেই—বিমান নেই, ট্রান্সমিটার নেই—অস্থির হবার প্রয়োজন নেই—দেখতে চাই তোমার লোকবল কত আছে—আর সে-সব লোকের মনোবল কতখানি। তোমার মন আছে, মানসিকতা সঠিক, বৈপ্লবিক আদর্শ আছে, আদর্শের জন্য জান কোরবানীর প্রতিজ্ঞা আছে—শুধু অস্ত্র নেই।

দুঃখ করো না। কারণ অস্ত্র তুমি পাবে—আজ না হলে আগামী কাল—আগামী কাল না হয় পরশু। কেবল তুমি তৈরি থাকো—শত্রুই তোমার অস্ত্র যোগান দেবে।

চে বললেন : আমাদের অস্ত্রভাণ্ডার হলো শত্রুর অস্ত্রের ভাণ্ডার। যেখানেই শত্রু পাও কৌশলে তাকে শেষ করো—তারপর তোমার প্রধান কাজ হলো শত্রু-অস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করা। কোন অবস্থায় একটি বুলেট অপচয় করো না। হয়তো ঐ বুলেট তোমার প্রাণ রাখতে এবং জঘন্য শত্রুকে খতম করতে পারে।

ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের আহ্বানে 'কর' উপজাতিরা দিয়েমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের হাতে কোন আধুনিক অস্ত্র নেই—তবু হৃদয়ে অকৃত্রিম আবেগ আর পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞায় তারা দিয়েমী সৈন্যের সঙ্গে মরণ-পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। তাদের অস্ত্র ছিলো আদিম যুগের—দুর অতীতের প্রস্তর যুগের। মোষের মত বিরাট বিরাট মস্ত পাথরের চাঁই টেনে তোলা হয় মাচানের উপর। মাচানগুলো একটি রশির দ্বারা যুক্ত থাকে—সৈন্যরা ফাঁদের ভেতর আসলে রশিটিকে টানা হয়—মাচান ভেঙে যায়—প্রচণ্ড আওয়াজে পাথরগুলো নামে—গুঁড়ো করে দেয় শত্রুদের উদ্ধত মস্তক। তাদের অন্য একটি কৌশল ছিলো 'টেনলুয়া''—আগুনের তীর। দেখতে সাধারণ তীরের মতো হলেও এর ভেতর কিছু অংশ থাকে ফাঁপা, সেই ফাঁপা অংশের কাছে থাকে গন্ধক, গ্যাসোলিনে ভিজানো খানিকটা তুলো আর একটি সলতে। নিক্ষেপের আগে সলতেটাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়—লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার মুহূর্তে ঘটে গন্ধক বিস্ফোরণ, ফলে গ্যাসোলিনের তুলোর টুকরো জ্বলে ওঠে নিমিষের মধ্যে, শত্রুর খড়ের বা তালপাতার ব্যারাক জ্বলে ওঠে।

অন্য অস্ত্রটির নাম হলো 'স্নুঙ ভান নাঙ' দশহাজার ফলদায়ক। ভাঙা এরোপ্লেন, মোটর গাড়ির ধাতব অংশ স্থানীয় কামারশালায়

পুড়িয়ে পিটিয়ে নিখুঁত ব্যাসের সহজ সরু ফাঁপা ছড়ির মতো তৈরি হয় বন্দুকের নল—তাই দিয়ে তৈরি করে বন্দুক, অব্যর্থ হাতে আঘাত করে শত্রুদের।

দিয়েমী সৈন্যরা যে-অস্ত্রটির সব চেয়ে বেশি ভয় করতো সেটি হলো ধনুক আর বিষাক্ত তীর। এই ধরনের তীরের সামান্য আঁচড় লাগলেই শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে—মৃত্যু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অবধারিত হয়ে ওঠে। ফো নিয়া এভাবে শত্রু নিধন করতো। সেজন্য রূপকথার মত ছড়িয়ে পড়ে—ফো নিয়া যাদু জানে। আসলে যাদু ছিলো অন্যত্র—তা হলো ঃ সীমাহীন বর্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে তার দলের অত্যুচ্চ মনোবল।

যুদ্ধ করছো—দেখলে তোমার সহযোগী মারা গেল—তোমার প্রথম কাজ তার অস্ত্র সংগ্রহ, প্রধান কর্তব্য হলো একটি বুলেটও যেন দুশমনের হাতে না পড়ে। অস্ত্র নিরাপদে রাখ। সতর্কতার সঙ্গে রাখ। মনে রেখ, সেই হলো তোমার বড় বন্ধু, তোমার প্রাণ, তোমার আশার, নিরাপত্তার, তোমার কামনার আর উদ্দেশ্যের, তোমার আদর্শ আর স্বাধীনতার যাদু-কবচ। সেই যাদুর কবচকে যত্নে রাখবে, নিয়মিত পরিচর্যা করবে, আদরে রাখবে—পোষা ময়নাটির মত হৃদয়ের কাছে আপন করে রাখবে। ফিদেল যুদ্ধে যাচ্ছেন—হাতে তাঁর প্রিয় টেলিস্কোপিক রাইফেল—খেতে বসেছেন, তাঁবুতে পাশে তাঁর ঐ প্রিয় বন্ধুটি—টেলিভিশন অন্ হলো, ফিদেল সমূর্তিতে অগ্নিবাণী ছাড়ছেন হাতে তাঁর ঐ যাদুর কবচ।

চে বললেন ঃ তোমার শক্তির উৎসমুখ শুকিয়ে যাবে যদি অস্ত্র সংগ্রহ করতে না পার—অথবা তোমার অস্ত্র শত্রুর হাতে পৌঁছায়।

যুদ্ধে জয়ী হতে চাও—অস্ত্রের উপযোগিতা আর তার নিপুণ ব্যবহার তোমার শিখতে হবে, শিখতে হবে প্রতিদিনের রক্তক্ষয়ী

সংগ্রামী অভিজ্ঞতার আলোকে আঘাত-প্রত্যাঘাতের তীব্রতম যন্ত্রণার দীপ্তি থেকে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ শিক্ষার গাইড-লাইন ছিলো: To train and to learn while we fight. গিয়াপ লিখেছেন: Training was in touch with practical fighting; the troops were trained in accordance with next day's fighting.

শত্রু কী অস্ত্র ব্যবহার করছে তা তোমার প্রথম জানতে হবে। সুযোগমত শত্রুর অস্ত্র দখল করো এবং সে অস্ত্রের ব্যবহার নিখুঁতভাবে শিখে নাও। শত্রুর ট্যাঙ্ক আছে, বিমান আছে—তোমার হাতে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মরচেধরা পুরনো রাইফেল। তোমার সামান্য অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধজয় সম্ভব কি?

চে বললেন: সম্ভব। সেজন্য প্রয়োজন শত্রুর সঠিক অবস্থান জানা, তার দৈনিক গতিবিধির সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা—সেজন্য প্রয়োজন তাদের আঘাত করার সুসময় এবং সফল সুযোগ সৃষ্টি করা। তোমার অস্ত্র নেই—কিন্তু বুদ্ধি আছে, তোমাদের বিমান নেই—আছে বলিষ্ঠ সাহসিকতা—যোগাযোগ যানবাহন নেই—আছে চলার ক্ষিপ্রতা; উন্নত অস্ত্র নেই, কিন্তু জানা আছে অতর্কিত আক্রমণের নির্ভুল কৌশল। এই কৌশল, বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা আর সাহসিকতার যৌথ প্রচেষ্টায় তোমায় উপহার দেবে শত্রু-অস্ত্র। এ কাজে ভুল হলে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে।

মোটকথা তুমি গেরিলা, তোমাকে শত্রু নিধন করতে হবে কৌশলে—যেমন করে পারো—যেমন ভাবে পারো এবং যা নিয়ে পারো।

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা

……তুই কাদিস নে, মা

হৃদয়ে আজ সাড়ে সাত শ' সূর্যের উত্তাপ ……

গেরিলাযুদ্ধ জণগণের যুদ্ধ।

জনগণের সমর্থন নেই—এ যুদ্ধ তুমি চালাতে পারবে না।

জনগণের সহযোগিতা নেই—এ-যুদ্ধ ব্যর্থ হবে।

জনগণের সহানুভূতি নেই—তোমার যুদ্ধ বৃথা।

গেরিলাযুদ্ধ জনগণের হয়ে জনগণের যুদ্ধ।

চে বললেন ঃ এ-যুদ্ধের শক্তির মূল কথা হলো গণ-সমর্থন। গণ-সমর্থন তোমার নেই—গণ-জীবন থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন—গেরিলাযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য থেকে তুমি বিচ্যুত। ডাকাত আর গেরিলাদের ভেতর পার্থক্য হলো—ডাকাত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারো সহযোগিতা, সহানুভূতি নেই তাদের প্রতি। এমন কাজ করো না-যাতে গণসমর্থন পাবে না ; জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার অবস্থা কী হবে ভেবে দেখ !

হানাদার সেনাবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে জনগণ তোমায় আশ্রয় দিতে ভয় পায়—তুমি লুকিয়ে আছো জেনে দস্যুবাহিনী সে গ্রামশুদ্ধ পুড়িয়ে দেয়—জনগণের হৃদয়ের গভীর সচেতন মনের অপ্রকাশিত চেতনায় তোমার প্রতি তাদের নীরব সহানুভূতি আছে—কিন্তু তারা তোমায় আশ্রয় দেয় না—সহযোগিতা করে না—করতে ভয় পায় ; সেজন্য তোমার উপস্থিতিকে তারা বিপদের লাল-সংকেত বলে মনে করে—তুমি কি করবে ?

ফিদেল বললেন ঃ তুমি তাদের বুঝাও—বুঝাও তোমার কর্মের কথা, বুঝাও আদর্শের ও বিপ্লবের এবং যুদ্ধের উপযোগিতার কথা—স্বাধীনতার মর্মবাণীর কথা। তোমার গোপনীয়তার শপথ নাও—বলো

তাদের, তোমার আচরণে ও কার্যে এমন কিছু করবে না যাতে তাদের ক্ষতি হয়। এমন অবস্থায় জনগণের মনোবলকে সবল করে তুলতে—তাদের ঘাড় থেকে শত্রুর ভয়ের ভূতকে তাড়াতে পারে একমাত্র বৈপ্লবিক আর Political moblisation। রাজনৈতিক দীক্ষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে দেখবে জনগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেবে আগ্রহে।

দেখলে, কিছুতেই জনগণ তোমার পাশে দাঁড়াচ্ছে না—তোমার নীতি আদর্শ স্বাধীনতা কিছুকেই প্রশ্রয় গ্রহণ করতে চায় না, এমতাবস্থায় –

মাও বললেন : জনগণের উপর অত্যাচার করো—কিছুটা পীড়ন করো। দেখবে ভয়ে তারা আশ্রয় দিয়েছে, সহযোগিতা করছে, সহানুভূতি না-ই বা হলো আন্তরিক। তখন তোমার কাজ হবে এদের কাছে ডেকে তোমার উদ্দেশ্যের কথা—যুদ্ধের লক্ষ্যের কথা—নীতি আর বৈপ্লবিক আদর্শের কথা বলা। দেখবে, ধীরে ধীরে তুমি তাদের কাছে সহজ হয়ে এসেছো। তোমার বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় অনেকেই আগ্রহী হবে। পরিচিত হবে। তাতে ফল হবে। জনগণ ধীরে ধীরে তোমার সাথে তোমার আদর্শকেও কাছে টেনে নেবে। এমনি করে জনগণকে তোমার বশে আনবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে অত্যাচার করবে ঠিকই—সে অত্যাচার যেন উদ্দেশ্যহীন না হয়—সে উদ্দেশ্য যেন তোমার স্বাধীনতার বিপ্লবের সহায়ক হয়। বিপ্লবীদের অত্যাচার আর সন্ত্রাসকারীদের অত্যাচারে পার্থক্য আছে। সন্ত্রাসকারীদের কাজ হলো সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা না বুঝেই কাজ করা। তোমার কাজ হবে বৈপ্লবিক কাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সোপান হিসাবে।

চে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন : তুমি যদি প্রয়োজনবোধে উৎপাদন বন্ধ করতে চাও—তবে কলটিকে নষ্ট করো না। কারখানাটি

মহানগর পাঠাগার
ঢাকা।

ভেঙে ফেলো না ; শুধুমাত্র বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দাও। দেখবে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে, কলের চাকা ঘুরছে না। সন্ত্রাসবাদীরা কিন্তু সাহস প্রদর্শনের ব্যাতিরেকে কলটাকেই ধ্বংস করে দেবে। গেরিলারা তা করবে না। কারণ জনগণ এই দেশের সম্পদ ধ্বংস হোক এটা চায় না। কলটিকে ধ্বংস করলে জনগণ তোমার প্রতি বিরক্ত হবে—তোমার কর্মধারা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ আসবে ; বলবে, এরা লুঠেরা—দস্যু। এটা গর্বের নয়—অগৌরবের।

এমন কিছু করো না যাতে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। গেরিলাদের নিয়ম আছে—নীতি রয়েছে। সে নিয়ম আর নীতি হলো জনগণের মঙ্গলবিধানের নিয়ম—জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার আর মমতাবোধের নীতি। যে সে নীতি মানে না—নিয়ম জানে না—সে গেরিলা নয়, ডাকাত। ডাকাতের কাজ ব্যক্তির জন্য, সমষ্টির জন্য নয়। স্বার্থ যেখানে প্রবল—ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্ন সেখানে, লভ্যাংশের দায় সেখানে—প্রতারণাই সেখানে মূলধন।

চে বললেন ঃ তোমার মূলধন ত্যাগ আর আদর্শ। পুঁজি হলো সমষ্টির কল্যাণ। লভ্যাংশ হলো জনগণের সমষ্টি। জনগণকে তুষ্টির ভেতর দিয়ে তুমি তাদের অনুপ্রাণিত করবে, তাদের মাঝে থেকে যেমন ফুলের সৌরভ ছন্দিত করে হিল্লোলিত বাতাসকে।

মাও কথাটিকে সুন্দর উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে বললেন।

বললেন ঃ The people are to the army what water is to fish. দেশের জনগণ হচ্ছে জল আর গেরিলা হচ্ছে মাছ। বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে যেমন বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি তেমনি আমরা যদি দেশের অসংখ্য মানুষকে নিয়ে এক বিরাট জনসমুদ্র গড়ে তুলতে পারি—তা হলে শত্রুরা নিশ্চয় তার মধ্যে ডুবে যাবে।

ভিয়েতনামে গেরিলাদের জন্য তিনটি মূল সূত্র বেঁধে নিয়েছিলো পার্টি ঃ

To respect the people,

To help the people,

To depend the people…in order to win their confidence and affection and achieve a perfect understanding between the people and the army.

জনগণকে শ্রদ্ধা করো—সম্মান করো—তাদের রক্ষা করো—তাদের বিপদে এগিয়ে যাও—দুঃখের দহনের যন্ত্রণার পাশে দাঁড়াও—হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে নাও। দেখবে তোমার কাজ সহজ হয়েছে, জনগণই তোমার হয়ে কাজ করছে।

একটি উদাহরণ ঃ দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধের কথা বলি। পার্টি ও সরকার বলল ঃ সবাইকে যুদ্ধে অংশ নিতে হবে—সাহায্য করতে হবে—সহযোগিতায় আহ্বান জানালো তারা। শ্রমিক এগিয়ে এলো কারখানা ছেড়ে, কৃষক এগিয়ে এলো লাঙল ফেলে, যুবক এলো—বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এলো কলম ফেলে—সম্মিলিত শপথ হলো ঃ All for the front, all for victory.

সবাই এগিয়ে এলো, তারাই দায়িত্ব নিলো সেনাবাহিনীর খাদ্য ও অস্ত্র পাঠানোর। দুর্গম রাস্তা—উপর থেকে অবিরত গোলা ফেলছে শত্রু-বিমান—যানবাহন অচল, তারপর অঝোরে বর্ষার বৃষ্টি, তার ভেতরে সামনের যুদ্ধরত বিরাট সেনাবাহিনীর জন্য দীপ্ত উৎসাহে জনগণ তাদের দায়িত্ব পালন করলো ত্যাগের আনন্দে আর কণ্ঠের উৎসাহে—মৃত্যুর ভয়কে করলো তারা তুচ্ছ। রাতারাতি সাঁকো করে সাঁজোয়া গাড়ি যাবে—পর্বত কাটো—সুড়ঙ্গ করো, সেনাবাহিনী চলাচল করবে। নদীর গতিকে বেঁধে ফেলো—স্রোতকে বন্ধ করো—নৌকায় গোলাবারুদ যাবে। গাড়ি চলে না—সংবাদ চাই—হাজার সাইকেল এগিয়ে এলো—কেউ খাদ্য নিলো—অস্ত্র নিলো—কেউ সংবাদের জন্য চলে গেল জোর হাঁকিয়ে।

ওষুধ চাই—ডাক্তার চাই—রাঁধুনী চাই—কত নেবে। সবাই এবং সবকিছুই যুদ্ধের জন্য All for front. দিয়েন-বিয়েন ফু-র ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের সফলতার কথা সামনে রেখে গিয়াপ বললেন :

Indeed, a strong rear is always the decisive factor for victory in a revolutionary war.

অকুণ্ঠ জনসমর্থন না থাকলে যুদ্ধজয় সহজে সম্ভব নয়। সুতরাং যুদ্ধ জয় করতে তাদের কষ্টের সঙ্গে, তাদের দুঃখের সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে, তাদের আনন্দের এবং বেদনার সঙ্গে, আর্তির আর উৎসবের সঙ্গে তোমার ইচ্ছার সৌরভকে মিলিয়ে নাও—তোমার বাসনার সম্ভারকে মিশিয়ে দাও। রোগের চিৎকারে আর দুঃসময়ের অন্ধকারে, প্লাবনের অভিশাপে আর ঝড়ের সর্বনাশায় তাদের পাশে বন্ধুর স্পর্শের উষ্ণতা নিয়ে দাঁড়াও—কেননা—Army and the people are the same heart.

জনগণের সহনুভূতি আদায় করো—সহযোগিতার হস্ত টেনে আনবার নিপুণ কৌশল তুমি প্রয়োগ করো। জনগণ সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে না—মনঃক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই—জনগণ তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আছে কি না—তোমার গতিবিধির কথা—তোমার আশ্রয় ও পকেটের কথা শত্রুর নিকট বলে না দিলেই বিরাট কাজ হলো : এই পরোক্ষ সমর্থনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি এবং নীরব আশীর্বাদই তোমায় সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে নিয়ে যাবে।

টি. ই. লরেন্স বলেন :

It (the rebel movement) must have a friendly population, not friendly but sympathetic to the point of not betraying rebel movements to the enemy Rebellions can be made by 2 per cent active in a striking force and 98 per cent passively sympathetic.

গেরিলাদের যাদুখেলা এখানেই।

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙেছিস ঘরবাড়ী,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলিতে পারি!

রাশিয়ার ফোমিনো গ্রামের গেরিলা দলপতি গ্রিশ্চিন বললেন ঃ বন্দী রেখো না কাউকে। মেরে ফেলো। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। মেরে ফেলো বিশ্বাসঘাতকদের শিশুকে, গর্ভবতী স্ত্রীকে, তাদের পরিবারবর্গকে, যাতে বিশ্বাসঘাতকের বীজ না থাকে।

ফিদেল বললেন ঃ গেরিলা যুদ্ধটাই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। সেজন্য বন্দীদের পীড়ন করো না। অত্যাচার করো না। মেরে ফেলো না। তাদের ছেড়ে দাও।

বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হতো ঠিকই, কিন্তু বন্দী করবার পর এমন কতগুলো কথা বলা হতো তাদের যাতে লজ্জায় তারা আর মাথা তুলতে পারতো না। একবার এক রক্তাক্ত সন্ধ্যায় গেরিলাদের আক্রমণে কয়েক শো বাতিস্তা সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো। তাদের বন্দী করার পর গেরিলারা তাদের হাতে কফি তুলে দিয়ে বলল ঃ আশা করি, তোমরা এরপর আমাদের সঙ্গে থেকেই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা যদি এ প্রস্তাবে রাজী না হও তবু তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে কিউবার রেড্‌ক্রসের মাধ্যমে। রাতে খাবার দিয়ে বলা হতো ঃ তোমরা বাতিস্তার কাছে ফিরে গিয়ে আবার আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। মনে রেখো, আজ যেমন তোমাদের বন্দী করেছি আবার তোমাদের ধরবো আমরা। সে দিনও মারবো না। পীড়ন করবো না। কফি দেবো। আবার দেবো। শুধু অস্ত্রগুলো নেবো। এমনি করে দ্বিতীয়—তৃতীয়বার ধরা পড়লেও আমরা তোমাদের ছেড়ে দেবো। এ রীতির ভেতর মৃত্যু বা দৈহিক অত্যাচার নেই—কিন্তু আছে এক ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা।

মালয়ের গেরিলারা বললো ঃ উদারতার অর্থ বর্বরেরা বোঝে না। মনে করে দুর্বলতা। ওদের ক্ষমা করে লাভ নেই। ওদের

হাতে পেলে সাথে সাথে খতম করো। তিলে তিলে যন্ত্রণা দাও। ধীরে ধীরে ভয়াবহতার ভেতরে হত্যা করো। খতম করো। যাতে শত্রুরা বোঝে আমাদের নির্মমতা; আমাদের ভয়ঙ্কর কঠোরতা, তাতে ওদের ভয়ে হাত কাঁপবে—পা কাঁপবে—মাথা ঘুরবে আমাদের উপস্থিতি দেখে—কথা শুনে মনোবল ভেঙে যাবে—সামনে বীভৎস চিত্রের চেহারা দেখবে—রাইফেল খসে পড়বে।

ভিয়েতনামের গেরিলারা বললো ঃ আমরা নারী আর শিশুকে হত্যা করি নে—তাদের উপর অত্যাচার করি নে—যদিও তারা আমাদের বোনের উপর, মায়ের উপর, যুবতীদের উপর বর্বর বলাৎকার চালায়। আমরা শুধু শত্রুদেরই হত্যা করি। একজন গেরিলার প্রাণের বিনিময়ে দশজন আমেরিকানের প্রাণ চাই। কিন্তু আমেরিকান যুদ্ধবন্দীদের তারা প্রাণে মারতো না। আমেরিকান বন্দী বোরাব্যাক বললেন ঃ প্রথম থেকেই এরা আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। চিন্তার রেখা আমার মুখে কুঞ্চিত হয়েছে ঃ ওরা আমাকে প্রথম দিনেই সোজা গুলী করে মারবে। দ্বিতীয় দিন গেলো। তৃতীয় দিনে আঁকাবাঁকা বিসর্পিল পথে রওনা হলাম; কখনো হেঁটে, কখনো সাম্‌পানে। ভাবলাম—দুরে নিয়ে গুলী করে মারবে। আমার ভয় ছিল সব সময়। কিন্তু তারা পিঠ চাপড়াতো, মুখের সামনে বন্ধুভাবে হাত নাড়তো, বাহুতে হাত রাখতো—নানারকম ইশারা ও ইঙ্গিতে আমার দুশ্চিন্তার ভয়কে ঝেঁটিয়ে দিতে চাইতো। আসল কথা ওরা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে—ওষুধ দিয়েছে। চিকিৎসা করেছে, বন্ধুর মত পাশে বসিয়েছে। বন্দী আমেরিকানদের কাছে এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করেছে, তারপর তাদের মুক্তি দিয়েছে।—এটাই ছিলো অতীতের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মুক্তিফ্রন্টের নীতি।

বাংলাদেশের যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কী ভাবা যেতে পারে। তারা হাজারো সম্পত্তি বিনষ্ট করেছে, সম্পদ লুঠ করেছে, ঘরে আগুন

দিয়েছে। তোমার খাদ্যশস্য কেড়ে নিয়েছে। গোলার ধান নিয়েছে। মায়ের সামনে মেয়েকে, বাপের সামনে মাকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে বলাৎকার করেছে। কচি মাসুম শিশুকে পা ধরে টেনে ফেঁড়ে ফেলেছে। সে তোমার হাতে বন্দী। তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে? তার উপর অত্যাচার চালাবে প্রতিশোধ স্পৃহায়—না আক্রোশে তিলে তিলে ভয়ঙ্করের আজাব দিয়ে তাকে শেষ করে ফেলবে? তুমি মুক্তিযোদ্ধা—তোমায় ভেবে কাজ করতে হবে—মুক্তির আলোকে মুক্তির লক্ষ্যে এগুতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর দস্যুদের পীড়ন করা যাবে না—হাতের মুঠোয় পেয়ে হত্যা করা যাবে না। পনেরশো' মাইল দুর থেকে তারা যুদ্ধ করতে এসেছে—এসেছে সামরিক জান্তার জঘন্য আদেশে। তাকে বন্দী করেছো—ভালো ব্যবহার করো, পীড়ন করো না। অত্যাচার করো না—হত্যা করো না। তাকে বুঝাও যুদ্ধের কারণ, কেন যুদ্ধ, কিসের যুদ্ধ, তোমার আদর্শের কথা বলো, নীতির কথা বলো। তাহাকে সহানুভূতির স্পর্শ দাও। বন্ধুর বাতাস হয়ে তার হৃদয়ে ছোঁয়া দাও। তোমার প্রতি তার আস্থা ফিরিয়ে আনো। তাকে দিয়ে বলাও: মুক্তিবাহিনীরা বন্দীদের উপর অত্যাচার করে না, বন্দীদের বধ করে না—আত্মসমর্পণ করলে নিরাপত্তার অভাব নেই মুক্তিবাহিনীর হাতে। পনেরশো' মাইল দুর থেকে আসা দস্যুবাহিনীর বৃষ্টি-কাদায়, আঘাতে, সংঘাতে, জনগণের বৈরীতায়, মুক্তিবাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে, অপরিচিত পরিবেশে মনোবল ভেঙে গেছে। অস্ত্র ফেলে দিতে পারলে অনেকেই বাঁচে। তাদের এই দুর্বলতাকে কৌশলে তোমায় ব্যবহার করতে হবে—প্রচারের মাধ্যমে: বন্দীর নিরাপত্তা আছে। এ প্রচারে যদি তুমি সফল হও, তাহলে দেখবে হানাদার বাহিনীর অনেকেই যুদ্ধের ক্লান্ত ও তিক্ত পথ ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

আর যদি হানাদার বাহিনী বোঝে আত্মসমর্পণ করলেও তাদের হত্যা করা হয়—বন্দী হলেও তাদের জীবনের আশা নেই—তখন

পশ্চিম পাকিস্তানের ফেলে আসা মধুর জীবনের রঙিন স্বপ্ন হাতছানি দেয় ঠিকই; কিন্তু ভারত মহাসাগরের বিপুল বাধা ঠেলে যাবে কোথায়—পথ নেই ঘরে ফেরার, সামনে বৈরী দেশ ভারত, ভয়ঙ্কর মুখর বঙ্গোপসাগর; লুকোবে কোথায়—আত্মসমর্পণ করা: হত্যা, যুদ্ধে পরাজিত হলে হত্যা, বন্দী হলে হত্যা! হত্যার পথ থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ জয়লাভ! তাই তারা জীবনের প্রয়োজনে, বাঁচবার তাগিদে সংগ্রাম করবে, Fight to the last. তাতে তোমার ক্ষতি হবে বেশি, সময় লাগবে বেশি। সেজন্য কৌশলী বুদ্ধি নিয়ে উদারতার প্রশস্ত পথে জীবনের নিরাপত্তা দাও —যুদ্ধ থেকে তাদের দুরে সরিয়ে আনো। এতে তোমার সময় বাঁচবে---বাঁচবে রক্ত—ত্বরান্বিত হবে স্বাধীনতা।

দালালদের সম্পর্কে তোমার হাত হবে কঠোর। তারা তোমার দেশের লোক; কিন্তু তারাই তোমার বড় শত্রু। দস্যুবাহিনীদের জনপদে পথ দেখিয়েছে তারা, বিশ্বাসঘাতকরা মুখোশ পরে গ্রামের পথে টেনে এনেছে বর্বরদের। স্বাধীনতাকামীদের নাম লিখে দিয়েছে, তোমার অবস্থানের সংবাদ জানিয়ে হানাদারদের—এ দালালদের ক্ষমা নেই। শত্রুর হাত হয়ে কাজ করেছে। সে হাত ভেঙে দিতে হবে চিরতরে।

ভিয়েতনামের গেরিলা নেতা ও প্রাদেশিক মুক্তিবাহিনীর স্টাফ অফিসার সাও নাম বললেন:

নিশ্চিত জানবেন, সর্বক্ষেত্রে একাধিক হত্যার জন্য দায়ী হলো মাত্র গুটিকয়েক মুখ্য দালালশ্রেণীর লোক।

কুখ্যাত কোন দালালকে খতম করলেই, তাকে হত্যা করার কারণ, তার অপরাধ ঘৃণ্য জীবনী—এগুলো লিখিতভাবে প্রকাশ্য স্থানে লটকে দিতে হবে। লটকে দিতে হবে আর আর কুখ্যাত দালালদের নাম-তালিকা, তাদের অপরাধ। বলে দিতে হবে, সেখানে আর

কোন অপরাধ না করলে তাদের ক্ষমা করা হবে। এতে দুই রকমের সুফল আসবে—জনগণের আস্থা আসবে মুক্তিবাহিনীর উপর এবং দালালী করার লোকের সংখ্যা কমে আসবে, দালালদের ভেতর দ্বিধা আসবে, দ্বন্দ্ব আসবে, নিরাপত্তার অভাব তাদের পাগল করে তুলবে।

ভিয়েতনামে গেরিলাদের ভয়ে দালালরা সৈনিকদের ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছিলো। গেরিলারা সেখানে গিয়ে মেগাফনে প্রচার করতো ঃ যদি তোমরা গুলী না চালাও আমরা চালাব না। কিন্তু তোমারা গুলী চালালে আমরাও চালাব এবং তোমাদের শেষ করে ফেলবো। দালালদের ছাউনি থেকে বের করে দাও, তোমাদের কিছু বলবো না। এতে কাজ হতো। সৈন্যরা দালালদের তাঁবু থেকে বের করে দিতো। আমরা ধরে তাদের খতম করতাম। কেননা, যে-কোন জেলায় গুটিকয়েক দালাল খতম করলেই সেখানে নিজেদের ইচ্ছামত যাতায়াত করা যেতো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

আলজিরিয়ার দালালদের পরিবারশুদ্ধ ধ্বংস করে দিত গেরিলারা যাতে দালালি করবার সাহস আর ইচ্ছা কারো না হয়। এতে জনগণের উপর বাড়তি অত্যাচার বন্ধ হতো। লোকজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো।

অবশ্য বাংলাদেশের রাজাকারদের সম্পর্কে নতুন চিন্তা এবং দ্বিতীয় ভাবনা প্রয়োজন।

ভিয়েতনামে দিয়েমী শাসন সারা দেশব্যাপী গেরিলা প্রতিরোধ-বাহিনী গঠন করে স্থানীয় ভিয়েতনামীদের সাহায্যে। ঠিক যেমন বাংলাদেশে বাঙ্গালী গেরিলাদের বিরুদ্ধে গঠিত হয়েছে রাজাকার বাহিনী, বাংলাদেশেরই সন্তান তারা। বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে—অস্ত্রধারণ করেছে তারা।

তোমার অঞ্চলে রাজাকার রয়েছে, তুমি গেলে তারা চ্যালেঞ্জ করবে, চলাফেরার উপর বিরাট বাধার প্রাচীর তারা—তোমার উপ-

স্থিত এবং অবস্থানের সংবাদ হানাদার বাহিনীকে জানাবে তারা। গ্রাম অক্রান্ত হবে, গ্রাম ধ্বংস হবে, তোমার নিরাপত্তার আস্তানা আর থাকবে না—এদের সম্পর্কে তোমার ব্যবস্থা কি হবে?

ভিয়েতনামে অদ্ভুত কৌশলে এসব দেশীয় তাঁবেদার ও ভাড়াটে সৈন্যদের মোকাবিলা করা হয়।

বেন ত্রে প্রদেশের নারীদের সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। সে খ্যাতির সাক্ষাৎ উদাহরণ হলো যুবতী লে থি থিয়েন। পিচফলের মত গায়ের রঙ তার, হাসলে গালে টোল পড়ে, হাঁটলে নৃত্যের ছন্দ জাগে। সে-ই সংগঠক বিক্ষোভ মিছিলের।

বিশ হাজার লোকের বিক্ষোভে প্রাদেশিক রাজধানীর অলিগলি পথঘাটে তিল ধারণের জায়গা নেই। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চলাচল অসম্ভব। যদিও বা সৈন্য আসে, সেই ভাড়াটে সৈন্যদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জননী বলে ওঠেন: ছেলেরা তোমরা সবাই আমার ছেলের মতো। আমার দুটি ছেলেও রয়েছে তোমাদের সেনাবাহিনীতে। বলতে বলতে দিয়েমী পোশাকের দুজন সৈনিকের ছবি মেলে ধরলেন তিনি: এরা ঠিক তোমাদের মতই। তোমরা আমাকে গুলি করলে তা হবে তোমার মাকে গুলী করার মতো। আমার পেছনের ঐ যুবতীকে গুলী করলে তা হবে স্ত্রীকে গুলী করার সামিল। তোমার গ্রামে বোমা বর্ষিত হয়েছে হয়তো তোমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে দিয়েমী সৈন্যরা। বিশ্বাস না হয় দিয়েমী সৈন্যের দ্বারা ধর্ষিতা দুজন স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। এই দেখ—শুকিয়ে যাওয়া তোমার লাগানো ফল গাছের ডাল, কলাগাছের পাতা, মৃত হাঁস-মুরগী-ছাগলের ধ্বংসের প্রদর্শনী। জনগণের যারা শত্রু, যারা তোমাদের নিজেদের মা-বোনদের হত্যা করছে ও ইজ্জত নিয়েছে তাদের জন্য তুলে রাখো ঐ বুলেট। হয়তো তোমার ইউনিট এ ধরনের কাজ করে না। কিন্তু অন্যরা কি করেছে দেখো, ধ্বংসের প্রদর্শনীর দিকে ইশারা করে। সৈনিক কৃষক। তাদের উপর

যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে কথাগুলো। দেশ সম্পর্কে, যুদ্ধ সম্পর্কে নতুন ভাবনা জন্ম নেয় তাদের মনে।

কোনো গ্রামকে ভিয়েতকং সন্দেহ করে সৈন্যরা হয়তো গোলা দাগার উদ্দেশ্যে কামান অথবা মর্টার ঠিকঠাক করতে শুরু করলো। অমনি ঐ গ্রামের সুসংঘবদ্ধ মহিলারা সেখানে গিয়ে হাজির হবে। দিয়েমী সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত তাদের স্বামী এবং আত্মীয়-স্বজনদের ছবি দেখিয়ে হয়তো বলবে ঃ আমরাও ঠিক তোমাদের পরিবারের মতো। তোমরা কি নিজেদের আপনজনের উপর গুলী চালাতে চাও? এরপরও যদি অফিসার ও সৈন্যদের মত পরিবর্তন না হয়, তখন তারা অস্ত্রগুলোর সামনে দল বেঁধে সারি করে দাঁড়িয়ে যাবে— বেশ, আগে আমাদের হত্যা করো। গ্রামে ফিরে গেলেও তোমাদের কামানের গোলায় মরতেই হবে।

এতে কাজ হতো। সৈনিকদের পক্ষে কয়েক হাজার গজ দূর থেকে লক্ষ্যবস্তুর উপর গোলা নিক্ষেপ এক কথা, আর মাতা বা স্ত্রীর মতো জীবন্ত মানুষের উপর সামনাসামনি অন্য কথা। এক ভাষা এবং এক জাতি বলেই এ ভাবে কৌশলে কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

যেখানেই সায়গন বাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে সেইখানেই প্রতি রাতে মেগাফন নিয়ে হাজার হাজার স্ত্রীলোক ঘাসের জঙ্গলে অথবা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। সম্ভব হলে এমন ঘাঁটি বাছা হয় যার ভেতরে ঐ স্ত্রীলোকদের কারো না কারো আত্মীয় রয়েছে। গ্রাম্য গৃহস্মৃতি—জীবনের মধুর দিনগুলোর স্মরণে রচিত কবিতা আবৃত্তি শুরু হয়। হয়তো ছুটে আসে দু' একটি উটকো গুলী। অমনি মহিলাদের ভেতর থেকে আত্মীয়দের নাম ধরে ডাক শুরু হয় ঃ ছান্ ছান্। আমি তোমার ভাইঝি লি থান। তুমি গুলী চালাচ্ছো কেন? ভাবলাম তুমি ও তোমার বন্ধুরা একঘেয়ে বোধ করছো, তাই কবিতা ও গান শোনাতে এলাম। কবিতা ও গান চলতে থাকে।

খুব যত্নে কবিতা ও গানগুলো বাছা হয়, যা শুনলেই চোখে জল আসে। ছোট্ট নদীর কথা—সুখী জীবনের কথা—এক খণ্ড সোনালী ধানী জমি দেবার আশ্বাস দিয়ে শেষে বলা হয় : ছান, এমন অসম্মানজনক জীবন তুমি কেন ছেড়ে এসো না ? ঐ মন্দ পথ ছেড়ে গ্রামে ফিরে এসো—সময় আছে এখনো—জনগণের পাশে দাঁড়াও। ইয়াংকিদের জন্য কেন জীবন দেবে ?—হয়তো ছুটে আস্‌বে গুলী আরো এক ঝাঁক। কিন্তু কথাগুলো পৌঁছে গেছে ঠিক জায়গায়। সকালে দেখা গেল : কয়েকজন সৈন্য নেই : ভাগুড়া।

এমনি করে মানসিক ও মানবিক দিক থেকে আক্রমণ করে তাঁবেদারবাহিনীকে অকর্মণ্য করে তুলছে ভিয়েতনামীরা।

বাংলাদেশে রাজাকার তাঁবেদারবাহিনী সম্পর্কে তোমার কৌশলী-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। পাঞ্জাবী হানাদারবাহিনী বাঙালীদের কাউকেই মনোপ্রাণে বিশ্বাস করে নি। বিগত তেইশ বছরের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস অন্তত তাই বলে। বাঙালী জাতিকে তারা ঘৃণা করে—বাঙালী জাতির উপরই তাদের আক্রোশ। হোক না সে জামায়েতে ইসলামের সদস্য কিংবা মুসলীম লীগের। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম দিকে তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে ; জামাত মুসলীম লীগ আওয়ামি লীগ বিচার করে নি। বাঙালীদের উপর জাতক্রোধই এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের মূল কথা। পরবর্তীকালে পলিটিক্যাল য়্যাটাক শুরু হলে তারা ভেদবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে—ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান দিয়ে জামাত ও মুসলীম লীগদের পৃথক চিহ্নের আসনে বসায়—যদিও সন্দেহ, ক্রোধ ও ঘনীভূত অবিশ্বাস তাদের উপরেও। সুফল ও কার্যসিদ্ধির জন্য তারা তাদের উপর সাময়িক আস্থার ভান করে রাজাকারবাহিনী গঠন করেছে—যদিও সন্দেহ থেকে তারাও মুক্ত নয়। হাদানার বাহিনীর এই জন্মগত সন্দেহের চোরাপথে সূক্ষ্ম প্রচারের বাতাস দিয়ে ফাটল ধরাতে হবে। রাজাকার এবং হানাদারবাহিনীর মধ্যে সন্দেহের মেঘকে ঘনীভূত

করে বিদ্রোহের ঝড় ডেকে আনতে হবে। তার জন্য সুযোগের সুন্দর ও যথাযথ ব্যবহার কাজে লাগাতে হবে।

রাজাকারবাহিনীর নিকট আত্মীয়-স্বজনদের রাজনৈতিক আদর্শে ও বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে—তাদের দ্বারাই রাজাকারদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। বলতে হবে যুদ্ধের আদর্শের কথা, বোঝাতে হবে স্বাধীনতার মর্মবাণীর কথা ; পশ্চিমা শোষণের ভয়ঙ্কর নগ্নতার কথা। মোটকথা রাজাকারবাহিনীর জন্য অনিবার্য ঃ মেণ্টাল আপরেশান। কেননা, তাদের অনেকেই রাজাকারবাহিনীতে গেছে পরিস্থিতির চাপে, পেটের দায়ে, পরিবেশের অনুষঙ্গী হয়ে।

অবশ্য যেসব সৈন্য ও রাজাকার জঘন্য অপরাধের প্রমূর্ত বাহক তাদের ক্ষমা করার কোন অর্থ নেই। যেসব এলাকায় রাজাকারবাহিনী স্থানীয় নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছে, পাক সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ত আজ্ঞাবাহী হয়ে কাজ করছে, তাদের নির্দেশে যুবতী মেয়েদের ধরে এনে পাঞ্জাবী সৈন্যদের লালসার খোরাক করছে, আর এ কর্মের জন্য আত্মতৃপ্তির মোহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে আদর্শ ও নীতিগত বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়ে মনেপ্রাণে যুদ্ধ করছে—তাদের ক্ষমা করা পাপ হবে। এসব জায়গায় নির্মমভাবে রাজাকারদের চরম শিক্ষায় তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে— তাদের হত্যা করে প্রকাশ্যস্থানে লট্‌কিয়ে দিতে হবে তাদের কুকীর্তির চরমপত্র। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, যেসব এলাকায় হানাদারবাহিনীসহ রাজাকারদের উপর সফল অপারেশন হয়েছে—সেখানকার রাজাকারবাহিনী হয় পাক-চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, নয় আত্মসমর্প করেছে। সেজন্য ক্ষেত্রবিশেষে রাজাকার সম্পর্কে তোমায় কঠোর হতে হবে--নির্মমভাবে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার হাড়গুলো দুমড়ে দিতে হবে।